১৬শ সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

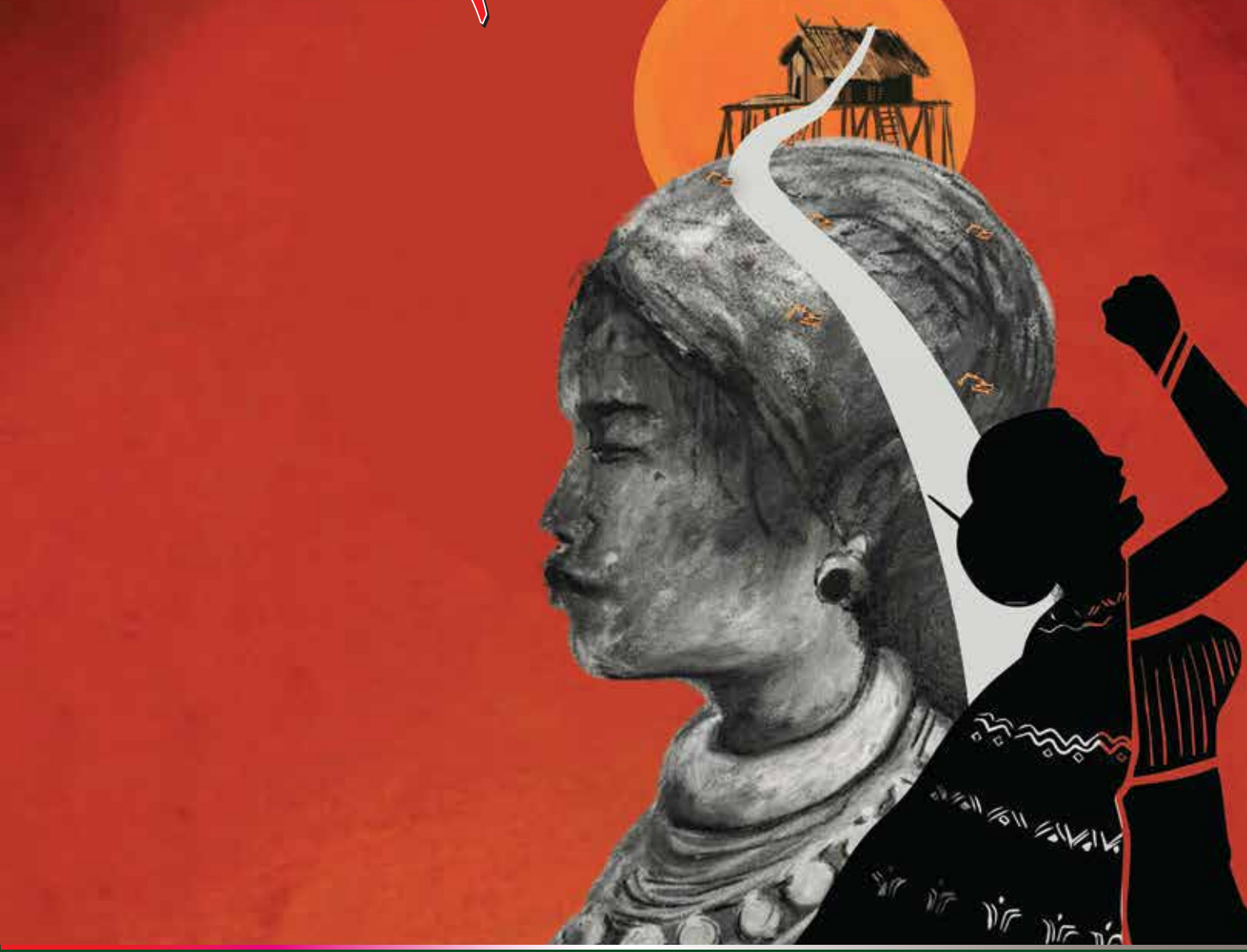

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত কর
Ensure the Constitutional Recognition of Indigenous Peoples
আদিবাসী নারী উপর সহিংসতা বন্ধ কর
Recognise The UNDRIP & Implement
28 Years of Chittagong Hill Tracts Accord
জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন।
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ তম বর্ষপূর্তি - ২০২৫
সফল হোক
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি, চট্টগ্রাম

Recognize My Identity
Recognize My Identity
State Celebrate The
Implement UN Policy of Indigenous Peoples
পাহাড়ের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুণর্বাসন করতে হবে।
জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চট্টগ্রামে আয়োজিত
গণসংগীত, র‍্যালি ও আলোচনা সভা
সফল হোক
সৌজন্যে- পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম, চট্টগ্রাম।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ০৬-১৮

পার্বত্য চুক্তি যদি বাস্তবায়ন না হয় সেটা হবে সেখানকার আদিবাসীদের সাথে বেইমানী: জাকির হোসেন ০৬

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করা একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার নিদর্শন: রাজেকুজ্জামান রতন ০৮

আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়: ডা. মোসতাক হোসেন ১০

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা সেনাবাহিনী ও প্রশাসন কর্তৃক প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়: কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ১১

যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবো না: কেএস মং মারমা ১২

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বললে যদি আমরা বাংলাদেশের সংহতি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকি তাহলে আমরা তাই করবো: শামসুল হুদা ১৪

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন অনিবার্য: খুশী কবীর ১৬

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে: ডা: গজেন্দ্রনাথ মাহাতো ১৮

প্রবন্ধ ১৯-৩৩

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র ২৮ বছর: একটি পর্যালোচনা - অমর শান্তি চাকমা ও ত্রিজিনাদ চাকমা ১৯

জুম্ম বিরোধী অপপ্রচার: প্রকাশ্যে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যাচার - সজীব চাকমা ২৫

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সূচনা ও সমাধানের উপায় - সোহেল তনচংগ্যা ২৯

বিশেষ প্রতিবেদন ৩২-৪৫

পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ৩২

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ৩৪

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ৪০

পাহাড়ে সহিংসতার বৃত্তে জুম্ম নারী: অধিকার বঞ্চনা থেকে সহিংসতার বাস্তবতা ৪১

সংবাদ প্রবাহ ৪৬-১১০

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন ৪৬

সেনামদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা ৪৯

সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল ৫১

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৫৯

সংগঠন সংবাদ ৬১

পার্বত্য চট্টগ্রামচুক্তি ১০১

১৬শ সংখ্যা ॥ নভেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
মার্চ ২০২৬

প্রচ্ছদ:
প্রমাণ চাকমা
সোহেল তনচংগ্যা

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সম্পাদকীয়

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেলো। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেড় বছর ধরে শাসন ক্ষমতায় আসীন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায় হয়েছে। অপরদিকে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠিত হয়েছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু লোক দেখানো উদ্যোগ নেয়া হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তৎকালীন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ'কে নিয়োগ দেয়া। তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সভা অনুষ্ঠিত হলেও সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা যে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে, তার কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ছিল খুবই নাজুক। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সবচেয়ে জঘন্য ছিল জুম্মদের বিরুদ্ধে সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রদান করা। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ও ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় বাঙালি মুসলিম সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের উপর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে চালানো হয় দুইটি নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ। এসব হামলায় ৭ জন জুম্ম নিহত এবং দুই শতাধিক জুম্ম আহত হয় এবং ভস্মিভূত করা হয় দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট। সেই সাথে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ছিল যে, এসব জঘন্য সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগে জড়িত কাউকেই বিচারের আওতায় আনা হয়নি। এভাবেই অপরাধীরা দায়মুক্তি পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

শুধু জুম্মদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসন কর্তৃক সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রদান করা হয়নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও সেটেলারদের লেলিয়ে দেয়া হয়। ফলে সেটেলারদের বাধার মুখে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সেই সাথে সেটেলারদের বাধার কারণে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগও স্থগিত করতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বাঙালি মুসলিম সেটেলার কর্তৃক এসব সরকারি কাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফ থেকে বাধাপ্রদানকারী সেটেলারদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করে প্রশাসনের তরফ থেকে সেটেলারদেরকে প্রকারান্তরে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছিল।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান না করে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করেছিল। জনসংহতি সমিতিসহ চুক্তি বাস্তবায়নে আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অবৈধ অস্ত্রধারী' হিসেবে তকমা দিয়ে ক্রিমিনালাইজ করা, মিথ্যা মামলা দায়ের করা, গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করা, অমানুষিক মারধর ও হয়রানি, বিচার-বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদি দমন-পীড়ন অব্যাহতভাবে চলেছিল। এই দমন-পীড়ন শুধু জুম্মদের

বিরুদ্ধে নয়, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত দেশের মানবতাবাদী নাগরিক সমাজকে নানা হুমকি দিয়ে তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিল সেটেলার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী।

অন্তর্বর্তী সরকার (ভূমি মন্ত্রণালয়) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তিন পার্বত্য জেলার ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এই প্রজ্ঞাপনে ধান্য জমি বা ১ম শ্রেণি জমির খাজনা ৫০ টাকা, পাউন্ডি বা ২য় শ্রেণি জমির ৩০ টাকা এবং পাহাড় (গ্রোভল্যাণ্ড) বা ৩য় শ্রেণি জমির খাজনা ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং চুক্তি মোতাবেক প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' এবং জমির খাজনা আদায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু উক্ত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে জমির খাজনা বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বেআইনী ও চুক্তি বিরোধী।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠিত হয়েছে। ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত দীপেন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে চট্টগ্রাম-৫ সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে নিয়োগ দেয়া হয়, যা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই। তাই তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে- এটাই পার্বত্যবাসীর প্রত্যাশা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকার ধানমন্ডি উইমেন্স ভলান্টারি এসোসিয়েশন মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার কর্মী ও নিজেরা করির সমন্বয়কারী খুশি কবির, এএলআরডি নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য কে এস মং মারমা, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন, লেখক ও সাংবাদিক এহসান মাহমুদ প্রমূখ। এছাড়াও আদিবাসী ছাত্র ও যুব সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক হিরন মিত্র চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন একই সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অমর শান্তি চাকমা ও ত্রিজিনাদ চাকমা।

পার্বত্য চুক্তি যদি বাস্তবায়ন না হয় সেটা হবে সেখানকার আদিবাসীদের সাথে বেইমানী: জাকির হোসেন, *যুগ্ম সমন্বয়কারী, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন*

আজকের সভার সভাপতি এবং মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি।

আপনারা জানেন জনসংহতি সমিতি প্রতিবছর একটা লেখা লেখে একটা বিবৃতি প্রকাশ করে সেটা আমরা গতকাল পেয়েছি। সেখানে তারা যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছে সেটা খুব

মনোযোগ সহকারে পড়লাম। সেখানে দেখবেন যে তাদের যে যুক্তি সেটাটো আমরা খন্ডন করতে পারিনি। সেখানে তারা খুব স্পষ্টভাবে বলেছে এই চুক্তি এখন কোন অবস্থায় কতটুকু কি পর্যায়ে রয়েছে। ওইরকম বক্তব্য আসলে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে দেখিনা।

প্রথম যে ভয়াবহ দিকটি হলো যদি আমরা গতবছর পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে তাকাই, শান্তি-শৃঙ্খলার দিকে তাকাই প্রচুর ভায়োলেন্স হয়েছে, প্রচুর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। ঘরবাড়ি পুড়েছে, মানুষ মারা গেছে। আমাদের কিন্তু সেটা কাঙ্ক্ষিত না। এখন আমরা যারা আদিবাসী নই, আমরা যারা বাঙালি, সেই বাঙালিদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিলাম। এখানে খুশী আপা আছেন, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন, তারা গোড়া থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছিল, সশস্ত্র সংগ্রাম হচ্ছিল আমরা যাতে এটাকে একটা শান্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে নেয়া যায় সেজন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আরো দেশের অনেকেই কাজ করেছি।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সরকারের সাথে যে চুক্তিটি হলো, অনেকেই বলে একটি বিশেষ সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু আমরা বলি রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিটি হয়েছে। আজকাল আমরা ফেসবুকে দেখি যে বিগত সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে সেই বিগত সরকার এখন আর নাই, চুক্তিও নাই। এই জিনিসটাই হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস প্রোপাগান্ডা।

আমরা মনে করি একটা চুক্তি যখন হয় তখন রাষ্ট্রের সাথেই হয়। সরকার তো একটা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র। যখন সেই প্রতিনিধি কোন চুক্তি করে তখন সেই চুক্তি রাষ্ট্রের চুক্তি, কোন পার্টিকুলার সরকারের চুক্তি নয়। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এটা উনি করেছেন, আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, এটা অত্যন্ত সিরিয়াস একটা প্রবলেম বাংলাদেশে। আসলে রাষ্ট্র কী, রাষ্ট্র কিভাবে গঠন করতে হয়, কিভাবে গড়ে তুলতে হয়, এইযে চিন্তার অনুপস্থিতি এই ধরনের উপেক্ষার মধ্যেও দেখতে পাই যে, এটা ঐ সরকার করেছে, আমাদের কোন দায়বদ্ধতা নাই। আজকাল খুব এগুলো আসছে।

তাহলে আমাদের নাগরিকদের ভূমিকা কী হবে। ভূমিকা অবশ্যই প্রথম থেকেই ছিল কিন্তু তারপরেও ২০২২ সালে আমরা চিন্তা করলাম যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি কোন কিছু হয় কিংবা আজকে ২৮ বছর ধরে পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে আছি এবং কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে সলিডারিটি জানাই আর সারা বছরের আর কোন দায়িত্ব আছে কিনা মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু এর বাইরে আমাদের মনে হয়েছে নাগরিকদের, মানবাধিকার সংগঠনের, অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আর বিভিন্ন সমমনা বুদ্ধিজীবীদের একটা বৃহৎ দায়িত্ব রয়েছে। এই চিন্তা থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

কিন্তু বাংলাদেশে সার্বিকভাবে পার্বত্য এলাকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। আমরা ময়মনসিংহ, রংপুর, খুলনা, বৃহত্তর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠান করেছি। সেই দিক থেকে মনে হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে একটা অসচেতনতা আছে, একটা অজ্ঞতা আছে। কেউ চুক্তি সম্পর্কে কিছু জানে না এবং কোন কিছু না জেনেই একটা মন্তব্য করে রাখে বলে যে ওখানকার যারা আদিবাসী আছে তারা ওই এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়।

এইটা হচ্ছে সবচেয়ে ভুল একটা স্টেটমেন্ট। যেটা দিয়ে একটা শত্রুতা তৈরি হয়, একটা ঘৃণা তৈরি হয়। কিন্তু তারা সবসময় ইনক্লুসিভ থাকতে চেয়েছে। আজকে প্রবন্ধের লাস্ট যে পয়েন্টটা এসেছে 'অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন' এবং 'প্রশাসনিক সহযোগিতা', এটা আমরা দাবি করে আসছি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন থেকে ২০২২ সাল থেকে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, এই আন্দোলনটা করে সারা বাংলাদেশে আমরা পার্বত্য চুক্তি সম্পর্কে সেখানকার আদিবাসীদের সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চাচ্ছি, একটা সলিডারিটি সৃষ্টি করতে চাচ্ছি।

এই দেশ আমাদের এই পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সেখানকার আদিবাসীদের রক্ষা করা, শান্তি বজায় রাখা এবং শান্তি উন্নয়নের জন্য আমাদের এই আন্দোলন থেকে চেষ্টা করে থাকি। এই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও আমরা প্রেস বিজ্ঞপ্তি, মানববন্ধন, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার লোকদের সচেতন করার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে খোলা চিঠি দিয়েছি যেটা পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারণা হয়েছে।

বাংলাদেশে যখন কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তখন তারা শুধুমাত্র নিজেদের দল কিংবা গোষ্ঠীভিত্তিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। সেজন্য আমরা তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলে একটা সুযোগ হিসেবে চিন্তা করি। আমরা মনে করি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বোধহয় কিছু একটা করবে। সেই কারণেই আমরা একটু একটিভ ছিলাম এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে যে অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা কিছু ভালো উদ্যোগ নিবে। কিন্তু দেখা গেছে আমাদের বারংবার বলা সত্ত্বেও, আন্দোলন সত্ত্বেও এই অন্তর্বর্তী সরকার সেরকম কোন উদ্যোগ নেয়নি।

আরেকটা দিক আমি মনে করি ভূমি কমিশনের বিষয়ে আমাদের বার বার বলার পর তারা ভূমি কমিশনের বিষয়ে কিছুটা পদক্ষেপ নিয়েছে। তারপর আমাদের পররাষ্ট্র

উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটা আলোচনা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ওই আলোচনা সভায় সরকার কর্তৃক কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেটা আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। সরকার সে বিষয়ে বিশদভাবে কিছু জানায়নি।

আমরা যারা এই বিষয়ে কথা বলি, আমাদেরকে বলা হয় আমরা নাকি বলি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুরো সামরিক ব্যবস্থাকেই সরিয়ে নিতে হবে। আমরা কিন্তু সে কথা বলি না, রাষ্ট্র নিরাপত্তার জন্য সামরিক ক্যান্টনমেন্ট থাকুক আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সারাদেশের মত যেভাবে ক্যান্টনমেন্ট হচ্ছে সেভাবে হোক। যেখানে ক্যান্টনমেন্ট দরকার নেই সেখানে কেন হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে চারটি ক্যান্টনমেন্ট আগে থেকেই আছে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনা ছাউনি গড়ে উঠেছে অপ্রয়োজনে কোন প্রকার নিয়ম না মেনে তাতে আমাদের আপত্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলেই যেভাবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সেভাবে বাংলাদেশের অন্য কোনখানে দেখা যায় না। সেটা হবে কেন? পার্বত্য চট্টগ্রাম তো বাংলাদেশের একটি অংশ। আমরা জানি বাংলাদেশ রাষ্ট্র সারাদেশে একটা সিভিল ল'-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসন কাঠামো পরিচালনা করে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন সেনাশাসন জারি থাকবে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কি তাহলে এদেশের একটি অংশ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে জেনারেল সিভিল প্রশাসনের অনুপস্থিতি সেটা স্পষ্ট।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা যেগুলো চুক্তির প্রাণ বলা যায়, যেগুলো অবশ্যই আগে বাস্তবায়ন প্রয়োজন, সেই গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোই সরকার বাস্তবায়ন করে নাই। সেগুলোর মধ্যে যদি বলি ভূমির অধিকার, প্রশাসন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোটার লিস্ট এগুলো আজ ২৮ বছরেও কোন সরকার বাস্তবায়ন করে নাই।

সমতলের আদিবাসীদের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের একটা দাবি সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটা ভূমি কমিশন গঠন। কিন্তু কোন সরকার তা বাস্তবায়ন করে নাই। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আশা দিলেও আজ পর্যন্ত সমতলের আদিবাসীদের জন্য সেই ভূমি কমিশন গঠনের কোন প্রকার উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করি নাই।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রসঙ্গে সার্বিকভাবে আমার আহ্বান থাকবে আমরা যারা আদিবাসী নই তাদের উপর যে সারাদেশে একটা ঐক্য সংগঠিত করে সরকারকে প্রেসার ক্রিয়েট করি যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অনেকেই বলেন, এই চুক্তি দুর্বল চুক্তি, নতুন চুক্তি করতে হবে। আবার অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়, এই চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি তার মাধ্যমে নাকি আমরা এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্য দেশের হাতে তুলে দিতে চাই। এই ধরনের মিথ্যা অপপ্রচার সঠিক নয়। আমি আগেও বলেছি, আরও বলছি আদিবাসীরা সবসময় ইনক্লুসিভ চেয়েছে, এক্সক্লুসিভ নয়। তারা নাকি বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমাও দেওয়া হয়। এধরনের অপপ্রচার যারা সৃষ্টি করছেন তারা প্রচন্ড অপরাধ করছে। আমরা চাই একটা ডকুমেন্ট আছে, সেই ডকুমেন্টটা ধরেই আগাতে চাই। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আর কিছু বলছি না।

আমরা যারা মানবাধিকার কর্মী আছি, আন্দোলনের সাথে জড়িত আছি, তারা কি বলছি, যে একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা এই রাষ্ট্র সাইন করেছে তা বাস্তবায়ন হোক। এই চুক্তি যদি বাস্তবায়ন না হয় সোজাকথা সেটা বেইমানি। কাজেই আমরা আমাদের দায় থেকে মুক্তির জন্যই এই পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করার স্বপক্ষেই লড়াই করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে শুনবার জন্য।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করা একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার নিদর্শন: রাজেকুজ্জামান রতন,

কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)

প্রতিবছর আসে ডিসেম্বরের ২ তারিখ আর আমরা বছর গণনা করি চাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশ। অতএব পরের বছর আমরা উনত্রিশ গণনা করবো। পার্বত্য চুক্তি হচ্ছে আমাদের চুক্তি ভঙ্গের একটি নিদর্শন। পার্বত্য চুক্তি হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করার একটা নিদর্শন। পার্বত্য চুক্তি হচ্ছে প্রতারণা করে একটি রাষ্ট্রের দায়হীনভাবে সময় কাটানোর নিদর্শন।

১৯৯৭ সালে যখন পার্বত্য চুক্তি হয় তখন আমি চট্টগ্রামে বাসদের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম। আমরা যখন সারা দেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি কখনো ভাবি নাই পাহাড়ি বাঙালি বিরোধ থাকবে। পরবর্তীতে সারাদেশ থেকে আমরা সামরিক শাসনকে অবসান করতে পারলাম। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা শাসনের অবসান করতে পারলাম না। বাসদের কাজের সাথে যখন আমি চট্টগ্রামে ছিলাম অনেক ঢাকঢোল পেটানো হলো যে, শান্তি চুক্তি হয়েছে, বাস্তবে তা হলো পার্বত্য চুক্তি। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হলেই পাহাড়ে শান্তি আসতে পারে, কিন্তু বাইরে প্রচার হয়েছে শান্তি হয়েছে।

আমরা বার বার বলি, একটা রাষ্ট্র একটা জনগোষ্ঠীর সাথে এরকম প্রতারণা চুক্তি কি করতে পারে? তাহলে সেই প্রতারিত গোষ্ঠীর রাষ্ট্রের প্রতি কোথাও কোন আস্থা কি থাকবে? রাষ্ট্র একটি জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি করেছে, সেই চুক্তি ন্যূনতম মর্যাদা রাখবে না, সেটি কি হয়? চুক্তির মর্যাদা রাখতে গিয়ে তো পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি অস্ত্র জমা দিয়েছে।

আমরা জানি মানুষ জড়িয়ে থাকে প্রকৃতির সঙ্গে আর প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সংস্কৃতি। সেজন্যই মরুভূমি অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি একরকম হয়, মেরু অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি একরকম হয়, সমুদ্র উপকুলের মানুষের সংস্কৃতি একরকম হয়, হাওরের মানুষের সংস্কৃতি একরকম হয়। তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি থাকতে পারে না? সেই সংস্কৃতির প্রতি কি আমাদের শ্রদ্ধা থাকবে না, সম্মান থাকবে না? বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণে কি এইদেশের আদিবাসীদের অবদান নেই? আমরা কি আদিবাসীদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবদানকে অস্বীকার করতে পারি? কিন্তু সংবিধানে আমরা লিখেছি বাঙালি জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে কি আদিবাসী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নেই? আমরা কিন্তু সংবিধানে এদেশের সমস্ত জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করি নাই। সেটা আমরা বার বার বলেছি, এদেশের সমস্ত জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষদের মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল, বৃটিশরা চলে গেলে এই দেশটা কেন হবে। তখন কোনটা বেশি গুরুত্ব পাবে ধর্ম না ভাষা-সংস্কৃতি। তখন ভারতে একটি ডিবেইট হয়েছিল সেই ডিবেইটের একটা মূল কথা ছিল ধর্মান্তরিত হওয়া সহজ, কিন্তু ভাষান্তরিত হওয়া সহজ নয়। একজন মানুষ চাইলেই তার ধর্ম পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু ভাষাকে সহজে পরিবর্তন করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় ধ্বনি, উচ্চারণ ভঙ্গি এগুলোর মধ্যে এমন ধরন তৈরি হয়ে যায় যে ঐ তামিলনাড়ুর মানুষ যতই শিক্ষিত হোক ঐ অস্ট্রেলিয়ার ইংরেজির সাথে আর অস্ট্রেলিয়ার ইংরেজির সাথে স্কটিশদের আর আমেরিকান ইংরেজি আর বৃটিশদের ইংরেজির বলার উচ্চারণ ভঙ্গি মিলবে না। এটা তৈরি হয় বংশ পরম্পরায়, এটা তৈরি হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাধ্যমে, ইচ্ছে করলেই এটাকে পাল্টানো যায় না। কলমের এক খোঁচায় বদলে দেয়া যায় না। বঙ্গবন্ধু যখন পাহাড়িদের বলেছিলেন তোমরা সবাই বাঙালি হয়ে যাও, তোমরা চাইলেও বাঙালি হতে পারবে না। বাঙালি যেমন চাকমা হতে পারবে না, তামিল হতে পারবে না, মারমা হতে পারবে না, ঠিক তেমনি তারা চাইলেও বাঙালি হতে পারবে না।

আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে অধিকারের লড়াইয়ে পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসীদের যেমন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, ঠিক তেমনি বাঙালিদেরও এগিয়ে আসতে হবে ন্যায়ের অধিকারের পক্ষের আন্দোলনে। চব্বিশ এর গণঅভ্যুত্থানে দাবি উঠেছে পাহাড় এবং সমতলে লড়াই হবে সমানতালে। তাহলে এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তো এই দাবিটা এসেছিল। যেখানে বৈষম্য আছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হবে। কিন্তু এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যারা ক্ষমতায় এলেন তারাই তো এই বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলার ভূমিকা পালন করলেন।

এই বেদনার মধ্যে আমরা চুক্তি করেছি আবার প্রতারিতও হয়েছি- এইটার মধ্যে প্রতিবছর আলোচনা হয়। আমরা মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোরও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা উচিত। খেয়াল করে দেখলাম যে, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে রাজধানীগুলো হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যের ধারক। রাজধানী মানুষ হচ্ছে কসমোপলিটন। যেমন নিউইয়র্ক শহরে ৮০০ ভাষা আছে। তাহলে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চল থেকে সেখানে অবস্থান করেছে। তাদের ছোট ছোট গোষ্ঠী আছে নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে, কিন্তু থাকছে নিউইয়র্ক শহরে। শহর মানে হচ্ছে কসমোপলিটন অঞ্চল, মানে হচ্ছে তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন পাহাড়, চর, হাওর প্রত্যেক অঞ্চলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অঞ্চলগুলোকে সুবিধা অনুযায়ী গুড়িয়ে দেয়ার একটা প্রবণতা আছে। এটার বিরুদ্ধে আমাদের একটা গণতান্ত্রিক লড়াই জারি আছে এবং আরো সংঘবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

চুক্তির মর্যাদা চাই, মানবিক মর্যাদা চাই এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাই। এই তিনটি বিষয় যেমন চাই তার পাশাপাশি আমরা চাই যে, মানুষ যেমন তার পায়ের নিচে একটু মাটি চায়, মাথার উপরে ছাদ চায়, দুবেলা খেটে খাওয়ার অধিকার চায়, শিক্ষার অধিকার চায়, চিকিৎসার অধিকার চায়- এই ন্যূনতম অধিকারগুলো কেন আমাদের অপূর্ণ থাকবে। এই অধিকারগুলো সকল নাগরিকের সমান অধিকার। নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু একটা

জিনিস খেয়াল করতে হবে, ন্যূনতম মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষের মানবিক অধিকার থাকতে হবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক এই সকল মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা চাই, নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা চাই এবং আমার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বাঁচতে চাই। ফলে এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে বাঁচবার জন্য আমরা একটা চুক্তির দৃষ্টান্ত রেখেছিলাম, এই চুক্তিটি অনেক দেশের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হতে পারতো।

আমরা মনে করি এখন আমাদের একটাই পথ আছে, চুক্তির দুর্বলতা থাকলে সেই দুর্বল দিক সম্মুখে আনতে হবে। কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। এই চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য যে আন্দোলন চলছে তা জারি রাখতে হবে।

আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়: ডা. মোসতাক হোসেন, *স্থায়ী কমিটির সদস্য, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল*

আজকের সভার সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট আলোচকবৃন্দ ও আমার সামনে দর্শকবৃন্দ, বাংলাদেশের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির জন্য পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কেন দরকার আমার চেয়েও এখানকার উপস্থিত সকলে জানেন। আজকে নানা রকম কথা বলে এই চুক্তিকে বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্লাটফর্মে পার্বত্য চুক্তি নিয়ে অপপ্রচার এবং দেশের মানুষদের কাছে একটা ভুল মেসেজ যাচ্ছে। এরই প্রতিবাদে কিংবা সচেতনতার জন্য, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্তে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় সভা, সমাবেশ, আলোচনা সভা, র‍্যালি এবং লিফলেট বিতরণসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

আজকে আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, ভূমি, সামাজিক রীতিনীতি রক্ষার জন্য আমাদেরকে আওয়াজ তুলতে হয়। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশেই এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের রক্ষার জন্য সেদেশের সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করে। সেটা বাংলাদেশে থাকবে না কেন। নিজ দেশেই সংখ্যালঘুদেরকে উচ্ছেদ করা হয়, তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সরকারের কাছে বিচার চাইলেও বিচার পায় না। এগুলোতো ঠিক না। নিজ দেশের জনগণের সাথে কেউ কি এইরকম দ্বিচারিতা করে?

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমির সমস্যাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বেশি বাধা দেওয়া হয়। এই ভূমি সমস্যাকে জিইয়ে রাখার জন্য একটি বিশেষ মহল থেকে সবসময় সেটেলারদের দিয়ে বাধা দেওয়া হয়। একটি বিশেষ মহলের ইন্ধনে ভূমি কমিশনের মিটিংয়ের সময় সেটেলাররা হরতাল দেয়, যাতে মিটিংটি হতে না পারে এবং সবশেষ সরকার মিটিঙটি স্থগিত করতে বাধ্য হয়। অন্য জায়গা থেকে নিয়ে গিয়ে সেখানে পুনর্বাসন করে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বছরের পর বছর সেখানে পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখেছে সেনাবাহিনী ও সরকার। যাতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হতে না পারে। নিজ দেশের মানুষের সাথে এই বৈষম্যমূলক আচরণ কোনদিনই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক, সেকুলার, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ দেখতে চাই। আর তার জন্য আমাদেরকে আমাদের দেশের আদিবাসীদের বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আজও আদিবাসীদেরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য রাস্তায় নামতে হয়। তাদের সাংবিধানিক অধিকার পেতে জীবন দিতে হয়। কিন্তু কথা ছিল স্বাধীনতার পরে একটা বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সমতাভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠা করা।

আমরা মনে করি যে, প্রতিটি জাতি, প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি বর্ণের মানুষের এই দেশের নাগরিক অধিকার ভোগ করার অধিকার রয়েছে। আমরা সবাই এদেশের নাগরিক। সবাইয়ের সমঅধিকার, ভোটাধিকার রয়েছে। আরেকটা হচ্ছে ইকুইটি। অর্থাৎ যারা পিছিয়ে আছে তাকে আমার সমান করতে হবে। একটি দেশের অগ্রগামী জনগোষ্ঠী থেকে যারা পিছিয়ে থাকে তাদেরকে সেই অগ্রগামী অংশের সাথে সমান তালে যাতে চলতে পারে তার জন্য সরকারকে সেই জনগোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা সবাই মানুষ। আমাদের সকলের এদেশের নাগরিক হিসেবে আইনের প্রোটেকশন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এভাবে চিন্তা করে যদি আমরা সবাই আগাতে পারি তাহলে পার্বত্য চুক্তি যেটা হয়েছে তা বাস্তবায়নে নিশ্চয়ই বড় অগ্রগতি করতে পারবো বলে আমি মনে করি।

যদিও এখন চুক্তি বিরোধী শক্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি অর্জন করেছে। তারা যেন মিথ্যা প্রচারণা আর মিথ্যা কথা বলে জনমানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে তার জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা তো সত্তর দশকে স্বাধীনতার পর পর পার্বত্য অঞ্চলে সরাসরি স্বায়ত্তশাসনের প্রতি সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু এখন তো বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বাধিকারের সংগ্রাম চলমান রয়েছে। তো ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দল অধিকারের পক্ষে। আমরা আছি, থাকবো, সবাইকে ধন্যবাদ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা সেনাবাহিনী ও প্রশাসন কর্তৃক প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়:

কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, *সভাপতি,*
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি)

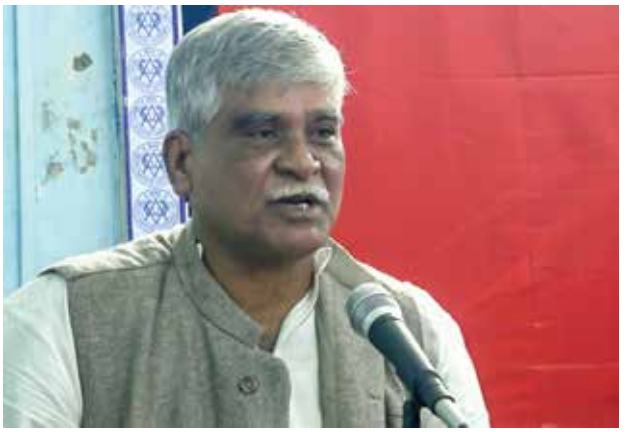

এখানে শুধু পাহাড়ের আদিবাসী না, এখানে আমাদের সমতলের আদিবাসীরাও আছে। ভূমির অধিকার থেকে আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য এলাকায় সেনা শাসন চলছে। বিষয়টা এরকম হয়ে গেছে যে, পার্বত্য এলাকা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। সারা বাংলাদেশের মানুষ একদিকে, আর পার্বত্য এলাকার মানুষ আরেকদিকে। আজকে পার্বত্য এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ, আক্রমণ প্রতিনিয়ত হচ্ছে। অথচ সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর নামে হাজার হাজার সেনা ক্যাম্প আছে। কিন্তু সেনাবাহিনী পাহাড়ে বড় ধরনের একটা ষড়যন্ত্র কার্যক্রমে লিপ্ত। তারা যখনই কোন পার্বত্য এলাকার জনগণ তাদের অধিকারের প্রশ্নে, তাদের ভূমির প্রশ্নে লড়াই সংগ্রামে নামে, তখনই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং সংশয় তৈরি করার প্রচেষ্টা থাকে। এটা আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি।

এখন জানি না কি অবস্থা। আমার একটা ছোট অভিজ্ঞতা আছে, আমি যখন ছাত্র ইউনিয়ন করা অবস্থায় প্রথম বান্দরবান যাই ১৯৮৭ সালে। আমি জানতাম না, ওই বাস স্ট্যান্ডে নামার পরেই দুটো লোক আসলো আমার কাছে। বলল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন'? আমি বললাম, আমি ঢাকা থেকে আসছি। 'আমাদের মেজর সাহেব আপনার সঙ্গে সন্ধ্যায় চা খাবেন।' আমি বললাম, কি ব্যাপার ভাই? মেজর সাহেবকে আমি জানি না, তিনি আমাকে চা খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন। তখন বলেন, না, আপনাকে আসতেই হবে। তখন তারা বললেন, আপনি কোথায় এসেছেন? আমি তখন বললাম, আমি আমাদের কেএস মং বড় ভাই তার বাড়িতে আমি যাব, ওখানে ছাত্র ইউনিয়নের একটা কর্মশালা আছে। মানে! যে অবস্থাটা, আমি একজন বাংলাদেশের নাগরিক। আমি আমার দেশের মধ্যে একটা জায়গায় যাচ্ছি। সেখানে আমাকে প্রতি পদে পদে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হচ্ছে। তার মানে চিত্রটা কত ভয়াবহ, এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি। আজকে এই চুক্তির ২৮ বছর পূর্তি পালিত হচ্ছে। বাস্তবায়ন কতটুকু হবে জানি না, তবে লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা বামপন্থীরা, প্রগতিশীলরা, দেশপ্রেমিক মানুষরা যারা আছি- এই লড়াইয়ের সাথে আমরা অতীতেও ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকব।

ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন যে, আমরা বামপন্থী গণতান্ত্রিক দলগুলো মিলে একটা নতুন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট করেছি। সেখানে আমরা শুধু রাজনৈতিক দল না, আমরা আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে সমতল পাহাড়ের আদিবাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির পেশার মানুষ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে, পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটা বৃহত্তর ফ্রন্ট আমরা গড়ে তুলতে চাই। রাষ্ট্রক্ষমতাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই। আজকে যদি আমরা পাহাড় ও সমতল বিভিন্ন সেক্টর যাদের কথা বললাম, তারা যদি সবাই যার যার অবস্থান বজায় রেখে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, যদি রাষ্ট্র ক্ষমতাটাকে আমরা চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়াতে পারি তাইলেই কিন্তু আদিবাসীদের ভূমির প্রশ্ন বা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিষয়টা ফয়সালা হবে, অন্য কোন পন্থায় ফয়সালা হবে না। তাই সেই ধরনের একটা শক্তির সমাবেশ এই বাংলাদেশে করতে হবে আমাদের এবং সেটা আমরা করব। সেই সাথে সাথে লড়াই, রাজপথের সংগ্রাম আমাদের সাথে আছে। আমরা সেখানে আছি এবং থাকব। এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি, প্রতিবছর যেভাবে বলা হয় এবারও তাই বলব যে, অবিলম্বে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা হোক। এই কথা ২৮ বছর ধরে বলা হচ্ছে আজকেও এই কথা বলা হচ্ছে। আমি আন্তরিকভাবে মনে করি, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হবে এবং শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রকে বিবেচনা করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে, বিবেচনা করতে হবে।

যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবো না: কেএস মং মারমা, *কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ*

এই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রেক্ষাপট, বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের পার্বত্য অঞ্চল ও বাংলাদেশের বিষয় যতগুলো বক্তা এরই মধ্যে বক্তব্য দিয়েছেন তারা মোটা দাগে বিষয়গুলো উত্থাপন করার চেষ্টা করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একজন কর্মী হিসেবে এবং এই পার্বত্য চুক্তির আলোকে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটুকু আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এই জাতীয় সমস্যা রাজনৈতিভাবে সমাধানের জন্য আজকে যারা মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন ছাত্রজীবন থেকে এখনো পর্যন্ত আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, এটি শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের দায়বদ্ধতা থেকে নয়, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীন এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি দায়িত্বের জায়গা থেকে উনারা কাজটি করেছেন।

আমার মনে পড়ে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি ছিলেন, আমাদের মোসতাক ভাই ডাকসুতে জিএস ছিলেন তখন থেকেই আমি পার্বত্য অঞ্চলের ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সেটিই বলতে চেষ্টা করেছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা মানে সেটি গোটা বাংলাদেশের সমস্যা অর্থাৎ এটি জাতীয় সমস্যা। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের একদিকে আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করছিলাম আর অন্যদিকে আন্দোলনকে তীব্র সচল রাখতে ছাত্র সংগঠগুলোকে একটি ঐক্যের মধ্যে আনার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কোন কোন সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, কোন কোন সময় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, সর্বোপরি নব্বইয়ের শেষের দিকে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন করা হয়। সেই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মধ্যে বাইশটা ছাত্র সংগঠন ছিল।

ডাকসুতে বসে একটি ছাত্র সমাজের রূপরেখা দাঁড় করানো হয়, সেটি হলো ছাত্র সমাজের দশ দফা। সেই দশ দফার ৭ দিন ব্যাপী আলোচনায় আমরা একমত হয়েছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং এর সমাধান রাজনৈতিকভাবেই হতে হবে। আমরা সেই আলোচনায় এও বলেছি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে আলোচনার মাধ্যমে একটি সত্যিকার শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে হবে। তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান করার জন্য যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেখানে একটি জাতীয় ঐক্যমতের সৃষ্টি হয়েছে।

পরবর্তীতে পার্বত্য চুক্তি হওয়ার পরে বাংলাদেশের এমন কোন রাজনৈতিক দল ছিল না যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করে নাই। এরশাদ সরকারের আমলে ছয় দফা। বিএনপি সরকারের সময় যখন জাতীয় জোট ছিল। এখানে একটা দিক বলতে হয়, সেই জাতীয় জোটে কিন্তু জামায়াতে ইসলামও ছিল। সেই বিএনপি সরকারের আমলে প্রথমে কর্ণেল অলি আহম্মদের নেতৃত্বে ছয় দফা, পরবর্তীতে রাশেদ খান মেনন (পার্লামেন্টে যখন এমপি ছিলেন) ৭ দফা বৈঠক হয়েছিল। সর্বশেষ শেখ হাসিনা সরকার আসার পরে ৭ দফা সর্বমোট ২৬ বার বৈঠকের পর এই পার্বত্য চুক্তিটি হয়।

এই চুক্তিকে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং রাষ্ট্র সমর্থন করেছেন। সর্বশেষ ১০ই ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে আমাদের নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে অস্ত্র জমা দেয়া হয় তখন সেখানে ১৪৭ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য জামায়াত এবং বিএনপি চুক্তির বিরুদ্ধে লং মার্চ করেছিল, কালো পতাকা উত্তোলন করেছিল।

পরবর্তীতে ২০০১ সালে যখন চারদলীয় জোট সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে, তখন তারাও কিন্তু পার্বত্য চুক্তি বাতিল না করে একটি পর্যালোচনা চুক্তি গঠন করে। সেই কমিটিতে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ১১ জন সদস্য ছিল। সেই কমিটিতে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ৫ জন সদস্য ছিলাম। সেই কমিটির ১১ দফা বৈঠকের পর মওদুদ আহমেদ মান্নান ভূঁইয়াকে বললেন, এই পার্বত্য চুক্তি সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী নয়। এই পার্বত্য চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এবং সেখানকার বাঙালিরা যারা আছেন তাদের আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ মডেল হিসেবে আমরা গণ্য করতে পারি।

আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে চুক্তি হলেও চার দলীয় জোট সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয় হস্তান্তর না করলেও আটটা বিভাগ হস্তান্তর করেছে। যদিও তারা লংমার্চ করেছিল। তারা বলেছিল আমরা পর্যালোচনা করেছি এই পর্যালোচনা করার পরে আমরা মনে করি এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের জায়গা থেকে তারা এই কাজটি করেছে।

আজকের বাংলাদেশের যে শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক অঙ্গণ আমাদের নেতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, চুক্তি করেছেন এখন কি করবেন, আপনার মন্তব্য কি? আমাদের নেতা সন্তু লারমা মহোদয় পরিষ্কারভাবে বলেছেন, চুক্তি করার চেয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন করা কঠিন এবং এই চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে দেশের সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশে একটি মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা না আসলে এই চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আঠাশ বছর আগে উনি যে কথা বলছিলেন, আজকে আবারও সেটাই আমাদের উপলব্ধি করতে হয়। বাংলাদেশে যখনই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, আমি প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থার কথা বাদই দিলাম, দেশে যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখতে পারি। আজকে ৫ই আগষ্টের যে স্পিরিটের মধ্যে গোটা যুব সমাজ ছাত্র সমাজ এবং গোটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের জায়গায় একটা বড় আঘাত পড়েছে। আমরা যারা নিজেকে প্রগতিশীল কর্মী হিসেবে দাবি করি, আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কথা বলি, আমরা যারা পার্বত্য চুক্তির পক্ষে কথা বলি এবং আমরা যারা মানবাধিকার, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আওয়াজ তুলি, আমাদের স্পেসগুলো যত কমে যাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধীতাকারীদের আস্ফালন তত বেশি বেড়ে যাবে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনো খুব আশাবাদী। এখনো আমাদের অনেকগুলো জায়গা আছে। সেই জায়গা থেকে বলি চিন, রাশিয়ার, ভারত, আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর আপনারা যারা আছেন হয়তো সাম্রাজ্যবাদীরা নানা ধরনের কথা বলবেন। কিন্তু বিশ্ব তো বিশ্বই। কোন রাষ্ট্র তো একক দল বা একক রাষ্ট্রের চিন্তকের সহযোগিতায় চলে না। রাষ্ট্র তো চলবে বিশ্ব ব্যবস্থাপনার একটা অংশ হিসেবে। সেই জায়গা থেকে আমি এখনো আশাবাদী।

পার্বত্য চুক্তি প্রসঙ্গে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বক্তব্য পরিষ্কার- বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা কোন অবস্থাতেই স্যারেন্ডার করতে পারি না। আমার ধর্ম, আমার প্রথা, রীতি-নীতির সব জায়গায় আমরা আজকে অস্তিত্বহীনতার মধ্যে আছি। কিছুক্ষণ আগে যিনি প্রবন্ধকার তিনি বলার চেষ্টা করেছেন যে, একটি মামলা হয়েছে হাইকোর্টে সেটি বন্ধ আছে। না, সেটি বন্ধ নাই। পাঁচটা মামলা হয়েছে চুক্তির বিরুদ্ধে। আপনারা দেখুন ১৯০০ সালের শাসনবিধি যে বিধির উপর কার্বারী প্রথা, হেডম্যান প্রথা, আমি চাকমা, আমি মারমা, আমি লুসাই এবং সেখানকার যে আদিবাসী সমাজের মূল প্রথা রীতিনীতি সেই প্রথার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। যেই কোর্ট থেকে বিচারপতি আমাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন, সেই বিচারপতি এখন প্রধান বিচারপতি। যিনি মামলা করেছেন আমাদের বিরুদ্ধে তিনি এখন স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের প্রধান প্রসিকিউটর। তাহলে অবস্থা দেখেন।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন একটা সামগ্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলন জাতীয় স্বার্থের আন্দোলন। এই জাতীয় স্বার্থের আন্দোলনে সকল সম্প্রদায়ের জনগণকে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। বৃহত্তর আন্দোলন মানেই আমরা কোনদিন স্যারেন্ডার করবো না। জীবন যদি চলে যাই যাবে, কিন্তু আমরা এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে গড়ে তুলব। এই ধরনের চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গেলে নানান ধরনের সমস্যা- আমলাতন্ত্রের সমস্যা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমস্যা- মুখোমুখী হতেই হবে। যে দল যে বিষয়বস্তু সমর্থন করে আর তার দলের নেতৃবৃন্দ সেই সমর্থিত বিষয়বস্তুর উপর বক্তব্য প্রদান করেন সেই বিষয়বস্তু সেই দলের মধ্যে পরিষ্কার না।

আওয়ামীলীগ সরকার রাষ্ট্রের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি করেছে। চুক্তি করার এক মাস পরে যখন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য হয়ে আমাদের লিডার সন্তু লারমার নেতৃত্বে যখন রাষ্ট্রপতির কাছে গেলাম। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন জিল্লুর রহমান। জিল্লুর রহমান বলেছেন নেত্রী আমার সাথে আলোচনা না করে চুক্তি করেছে, আইন করেছে। আমি বললাম আপনি তো স্থানীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। তো এই আইন পাস করার আগে কি মন্ত্রীপরিষদে এটা উত্থাপিত হয়নি?

যেই সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির আসনে আনার জন্য আমি, চন্দন ভাই, রতন ভাই, মোস্তাক ভাই, জীবন দিয়ে চেয়েছি। আমরা ছাত্র সংগঠন থেকে আট দলীয় জোট সরকারকে প্রথমে তিন ঘন্টা, তারপর ছয় ঘন্টা, তারপর ১২ ঘন্টা আল্টিমেটাম দিয়ে আমরা বলেছি আট দলীয় জোট সরকারকে অবিলম্বে ১২ ঘন্টার মধ্যে একজন রাষ্ট্রপতি ডিক্লেয়ার করতে হবে। তখন সচিবালয়ে কোন সরকার নাই। সেই রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ডিজিএফআই চীফ, এনএসআই চীফ এর সামনে আমার সামনে বলেছেন, সন্তু লারমা জিতেছে, শেখ হাসিনা হেরেছে। আমি বললাম, মাননীয় রাষ্ট্রপতি সাহেব আপনি কি চুক্তিটি পড়ে দেখেন নাই? তিনি বললে সবটুকু পড়া হয়নাই।

আওয়ামীলীগ চুক্তি পড়ে দেখে নাই। শুধুমাত্র শেখ হাসিনা চুক্তি

পড়ে দেখেছে আর মহিউদ্দিন খান আলমগীর এই চুক্তির ড্রাফট করেছে। এই মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে নিয়ে যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাসির ভাইয়ের কাছে গেলাম তখন মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে বলেছিলেন, গেট আউট, আমলা মানে না, চুক্তি করেছো আমাকে দেখাইনি। তখন নাসিম ভাই দুটো মন্ত্রনালয় দেখতেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর ডাক মন্ত্রণালয়। এই হলো আওয়ামীলীগ। এই হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের অবস্থা। আবার অন্যদিকে যারা আমলা আছেন, তারা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করার পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত প্রশাসন করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের মধ্যে এককেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থা এমনভাবে মগজে ঢুকে গেছে যে, একজন চৌকস অফিসার যদি কোন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা হন, তার কোন মূল্য নেই সচিবালয়ে। ঐ সচিবালয়ে যিনি মন্ত্রীর পিএস আর সচিবালয়ের এসিসটেন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্বে থাকেন তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে ছড়ি ঘোরায়। এই হলো বাংলাদেশ। এমন একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা আঠাশটা বছর চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি। জাকের ভাই বলেছেন, চুক্তি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বাস্থ্য বিভাগ, সিভিল সার্জন উনাকে এসডি লেখেন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য বিভাগের যে অবকাঠামো যে অফিস সে অফিস হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে ডিপিএইচও থানার যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা উনাদের বেতন এখনো ঢাকা থেকে দেওয়া হয়। এটা জেলা পরিষদের থেকে নয়, কি একটা আজব। এটাই হলো আংশিক হস্তান্তর। তার মানে জেলা পর্যায়ে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কার্যালয়, সিভিল সার্জন কার্যালয় হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে এখনো হস্তান্তরিত হয়নি। এভাবেই সবগুলোতেই লেজে গোবরে গড়মিল রয়েছে।

দক্ষিণপন্থী মৌলবাদীদের যে আস্ফালন, সেই আস্ফালনের জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি থাকবে কি থাকবে না, এটা আমাদের চিন্তা ছিল। সেই জায়গার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবেক্ষণ কমিটি গঠিত হয়েছে। ভূমি কমিশন পুনর্গঠন হয়েছে, টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন ও পরিবেক্ষণ কমিটি একটা বৈঠক করেছে। সেই বৈঠক রাঙামাটিতে হয়েছে। কিন্তু সেই বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো আজ ছয় মাস হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা তো মনে করেছিলাম, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ গোটা বাংলাদেশের যেভাবে আস্ফালন শুরু হয়েছে, আগে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী ধর্ষণ হতো, অত্যাচার হতো, গ্রেফতার হতো। কিন্তু এই সরকার এসে ঢাকা শহরে ছাত্র সংগঠনের নাম দিয়ে আমাদের বোনের উপর অত্যাচার করেছে, আমাদেরকে মেরেছে, মামলা হয়েছে। যারা আসামি তাদেরকে গ্রেফতার করছে না।

তবে এটা তো একটা বাস্তবতা এবং এটা প্রাসঙ্গিকভাবে সবাই মেনে নিয়েছে। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে জয়যুক্ত হওয়ার পর সংসদে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা যে বক্তব্য রেখেছেন, সংস্কারের প্রশ্ন উঠলেই আজকে সমস্ত রাজনৈতিক দল এম এন লারমার সেই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা টেনে আনছেন এবং সকলেই এখন এম এন লারমার বক্তব্য স্বীকার করছেন। এটাকে ধরেই আমাদের এগোতে হবে। আমি জানি না, এই যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে, গণভোট হবে, সেই গণভোটের পরে যখন সংসদ হবে সেই সংসদের যে ডিবেট হবে সেই ডিবেটে কারা প্রতিনিধিত্ব করবে। কিন্তু আদৌ আমাদের অবস্থা কি হবে সেটা নিয়েও সন্দেহ আছে। সেই জায়গা থেকেই দেড় মাস দুই মাস যা সময় আছে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, আমরা লড়াই করি, সেই আহ্বান জানিয়ে আর আজকে যারা আপনারা এখানে এসেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে ধন্যবাদ।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বললে যদি আমরা বাংলাদেশের সংহতি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকি তাহলেও আমরা তাই করবো: শামসুল হুদা, *নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি*

২৮ টা বছর। এই ২৮ বছরে আমরা একটা কথা বুঝেছি, যে শিশু ২৮ বছর আগে জন্মেছিল সে এখন তরুণ। আমরা যারা এই চুক্তি নিয়ে একসাইটেড হয়েছিলাম যে এখন এই চুক্তি বাস্তবায়ন হবে এবং আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যাতায়াত শুরু হবে। তারপরে অনেক সময় চলে গেলো। তারপর অনেক বাধা-বিপত্তি, পিছিয়ে পড়া এবং মারধর খাওয়ার পরিস্থিতি,

সবই আমরা মোকাবিলা করেছি। অনেকে হয়ত জানে না কিন্তু আমরা পিছিয়ে নেই আমরা লেগে আছি, প্রথমত হচ্ছে যে আমরা আশাবাদী মানুষ, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে, আমরা যা বলেছি যা করছি সেটা ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, জাস্টিস প্রতিষ্ঠা করার লড়াই, আমরা কোনো অন্যায় করছি না।

এই দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে যা হওয়া উচিৎ, যেমনটি হওয়ার কথা ছিল সেটা করার জন্য লড়াই করছি। আমরা অনেক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, অনেক ধরনের বিশ্বাস ভঙ্গ দেখেছি এবং দেখছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে, যে কথাগুলি আমার পূর্ববর্তী বক্তা দাদা বলে গেলেন, এইটার একটা গ্লোবাল সিগনিফিকেন্স আছে, একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে। এই চুক্তিটি একটি রাষ্ট্রের সাথে একটি অঞ্চলের স্বাক্ষরিত হয়েছে, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির না। রাষ্ট্রের সাথে একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, তাঁদের সংস্কৃতি এগুলির সুরক্ষার ব্যাপারে গ্যারান্টি দেওয়ার একটি প্রতিশ্রুতি এই চুক্তি। অতএব এদেরকে কেউ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যেতে পারবে না। এই ব্যপারে আমার পূর্ববর্তী বক্তা এর পেছনের যে ইতিহাস তার অনেকগুলি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যে রাজনৈতিক দলটি এই চুক্তিকে বিরোধিতা করেছিল, কালো পতাকা মিছিল করেছিল, তারাও শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি বাতিলের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি বা বাতিল করেনি এবং তারা বলেছে যে সেটা আবেগের কথা। এটা বাস্তবায়িত হতে হবে এই কারণে যে রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতাকে যদি সুরক্ষা দিতে হয়, রাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতকতা কারোর জন্যে কাম্য না। অতএব সেই কারণেই কেউ এটাকে বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা বা দাবি করলেও রাষ্ট্র কোনোটাই করেনি এবং ভবিষ্যতেও আশা করি করবেন না। এটা হয়ত ঝুলিয়ে রাখবে, ঝুলিয়ে রাখলে হয়ত আরো জটিলতা বাড়বে। আমরা যদি মনে করি বাঙালি মুসলমানরা এই বাংলাদেশ ভূখন্ডে সংখ্যাগরিষ্ট, এই সংখ্যাগরিষ্টতার জোরে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি, পৃথিবী জুড়ে অনেক দেশ সেটা করে থাকে, কিন্তু এটা কিছুদিনের জন্য হয়তো চালিয়ে নেয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কোনদিন হয় না।

২৪-এর গণআন্দোলন বা গণঅভ্যুত্থান এত রক্তপাত, এতগুলো মানুষের প্রাণের বিনিময়ে যে প্রতিশ্রুতি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার, পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীসরকার প্রতিষ্ঠার পর সেই বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কি রাখতে পেরেছে এই অন্তর্বর্তী সরকার? বরং আমরা দেখেছি এই সরকারের আমলে একটি মব কালচার প্রতিষ্ঠা হতে। কাউকে ট্যাগ লাগিয়ে নিজের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার করার কালচার প্রতিষ্ঠা হতে। এত মানুষের প্রাণের বিনিময়ে এই প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়িত না হয় এই দেশের জনগণ কি আমাদের ক্ষমা করবে? করবে না।

ইতিমধ্যে আমরা দেখছি, যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে একটার পর একটা খুন করা হয়েছে। প্রথমে নারী সংস্কার কমিশন ছিল না, তারপরে একটা নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন হলো, কিন্তু নারীদের উপস্থিতি এবং প্রতিনিধি ছিলেন না। এতোগুলো সংস্কার কমিশন একটাতেও আদিবাসীদের প্রতিনিধি ছিল না। আমরা ভূমি, কৃষি সংস্কার কমিশনের দাবি জানিয়েছি, সেই কমিশন করা হয় নাই। তার মানে প্রথম থেকেই এই বৈষম্য ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র কাঠামোতে অক্ষত রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে যে কথাগুলো করা হচ্ছে, এই কথাগুলো আগেও করা হয়েছে এবং জুলাই আন্দোলনের মধ্যেও এই কথাগুলো আসছে এবং দেয়াল লিখনেও লেখা হয়েছে। আমাদের তরুণ সমাজ সেই দাবিগুলো তাদের স্বপ্ন হিসেবে সেগুলি গ্রহণ করেছে এবং সেখানে সব ধরনের বৈষম্যর অবসান ঘটাতে হবে, ধর্মে ধর্মে বৈষম্য থাকবে না, জাতিতে জাতিতে বৈষম্য থাকবে না, শ্রেণিতে শ্রেণিতে বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আমরা একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হতে দেখেছি এবং মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছি যে, যেই লাউ সেই কদু। এই দাবি যারা করেছিলেন, যারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারা বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানি করে সরে যাচ্ছেন।

আমরা সাধারণ মানুষের সাথে বেইমানি করতে পারব না। আমরা এটা মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও ষড়যন্ত্র হতে দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের নাম করে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ, অর্জনগুলো নিয়ে ধ্বংস করার পথ বানানো হয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে না, গত ৫০ বছর ধরে আমরা তা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধগুলোকে বাস্তবায়ন করার পথটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধকে পিছিয়ে ফেলা যায়নি, যাবেও না।

আর জুলাই আন্দোলনের যে অর্জন, বৈষম্য বিরোধী সমাজ, রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতি, এটাকে হয়ত বাধাগ্রস্ত করা যাবে, কিন্তু মুছে ফেলা যাবে না। আমরা দেখেছি, হিল ট্রাক্টস নিয়ে কি ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। আমাদের একটাই অপরাধ, আমরা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন চাই। অতএব আমরা বাংলাদেশের সংহতি বিরোধী, আমরা ষড়যন্ত্রকারী। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে কথা বলে যদি আমরা ষড়যন্ত্রকারী, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলার জন্য যদি আমরা ষড়যন্ত্রকারী হয়ে থাকি তাহলে আমরা তাই করবো। এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে মূল বাধা তার মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন এজেন্সিগুলি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই। এটা শুধু পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের কথা বললে হবে না, আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের পক্ষ থেকে আরো কিছু বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। একই সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও এই দাবি

বোঝানোর জন্যে, তাদেরকে কনভিন্স করার জন্যে, আন্দোলনে সামিল করার জন্যে, তাঁদের কিছু বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। আরও বিশেষ করে আমাদের যে আমলা নির্ভর রাষ্ট্র দপ্তর, বিশেষ করে সিভিল প্রশাসন, আরবিট্রেরি প্রোগ্রেস, সেগুলোকে কিভাবে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় এই ব্যাপারেও আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একটি উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা তো ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা, আমরা তো চেঁচাতে পারি, কিন্তু আমাদের চেঁচিয়ে কোনো কাজ নেই। সেই কারণে, এটা আমাদের নিজ দায়িত্বে নিতে হবে।

আমরা যেটা করতে পারি, সেটা সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অনেক কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সামনে নির্বাচন, সকলের সাথে মিলে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো উঠে এসেছে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা যায় এবং কিভাবে সবাইকে সংযুক্ত করা যায় এবং পার্বত্য চুক্তি তথা আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার দাবিগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

এই নির্বাচন সব সমস্যার সমাধান দিবে না। নির্বাচনের পরেই আমাদের সব দাবিগুলো পূরণ হবে আমি তাও আশা করি না। কিন্ত এই বিশ্বাস আমি করি যে, কিছু কিছু অন্তত হবে এবং এই ভালো মন্দের মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমাদের যাত্রা অনেক দীর্ঘ, এই দীর্ঘ যাত্রার শেষে নিশ্চয়ই একটা সফলতার জায়গায় আমরা পৌঁছাবো এই বিশ্বাস আমাদের আছে। সবাই মিলে যদি আমরা অগ্রসর হই তাহলে একদিন আমরা অবশ্যই সফল হবো।

একটি কথা বলে আমি শেষ করবো, জাতিসংঘ আদিবাসী বিষয়ক একটা সেমিনার আয়োজন করে। বাংলাদেশসহ ১০০ টির বেশি দেশে আদিবাসীরা বাস করে, সেসব দেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন এবং এই ১০০ টির রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিতি থাকেন। সারা পৃথিবীতে ৬% মানুষ আদিবাসী। এই ৬ ভাগ মানুষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করেন, তাঁদের জীবনবোধ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি তার মাধ্যমেই এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করেন। আর এই জীববৈচিত্র্য আমাদের অস্তিত্ব ও মানব সভ্যতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। অতএব, আদিবাসীদের সম্মানের সাথে, মর্যাদার সাথে সুরক্ষা দেয়ার দায়িত্ব এই বাকি ৯৪% মানুষের। এই উপলব্ধি থেকে জাতিসংঘ প্রতিবছর সেমিনার আয়োজন করেন যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার প্রধানরাও উপস্থিত থাকেন এবং আদিবাসীরা সেখানে তাদের সমস্যা আলোচনা করেন।

অতএব আমরা দুর্ভাগা এই তথ্যগুলো গুরুত্ব দেই না, বুঝতে পারি না। যদি বুঝতাম তাহলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এই দশা হতো না। সময় বদলাচ্ছে, এই উপলব্ধি আমাদের আসা দরকার। আমাদের প্রয়োজন আদিবাসীদের সুরক্ষা দেওয়া, মর্যাদা ও সম্মানের সাথে বসবাসের ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকারগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব। আমি কামনা করি নিশ্চয়ই আমাদের রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দলগুলো, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ জনগণ সকলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে, তাঁদেরকে বোঝার চেষ্টা করবেন। শুধু নিজেদের স্বার্থ না দেখে এ সকল সাধারণ আদিবাসীদের কথা, তাদের অধিকারের কথা গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করবে এই রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি গুরুত্বসহকারে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের যে সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা, সেটা উপলব্ধি করে এর বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বোপরি পার্বত্য সমস্যা শুধুমাত্র তাদের সমস্যা না, এটা সারা বাংলাদেশের সমস্যা। সুতরাং এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার, আমলা, বুদ্ধিজীবী তথা সারাদেশের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন অনিবার্য: খুশী কবীর, *মানবাধিকার কর্মী ও সমন্বয়কারী, নিজেরা করি*

২৮ বছর হয়ে গেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর। এই ২৮ বছর পর আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা দেখতে পাচ্ছি। চুক্তি পক্ষীয় থেকে একটি পাবলিকেশন ছাপানো হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, পার্বত্য চুক্তির কোন কোন ধারা বাস্তবায়ন হয়েছে আর কোন কোন ধারা বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা যদি লক্ষ করি পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৪৭ সালে কত পার্সেন্ট বাঙালি বসবাস করত আর বর্তমানে কত পার্সেন্ট। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে একটা ডেমোগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালিদের পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য ১৯০০ সালের শাসনবিধি মাধ্যমে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। আপনারা বিভিন্ন বক্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন ১৯০০ সালের শাসনবিধিতে আদিবাসীদের ভূমি, রীতি-নীতি, প্রথা প্রাধান্য দিয়ে শাসন পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সময়ও এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে শাসন-বহির্ভূত এলাকা হিসেবে রাখা হয় পার্বত্য চট্টগ্রামকে। মোট কথা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই এলাকার আদিবাসীদের অঞ্চলকে একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যাতে তারা নিজেদের সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও প্রথা মেনে বসবাস করতে পারে। আদিবাসীরা যেন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনায় চলতে পারে। যতদূর জানা যায়, ঐ এলাকায় কোন সময় মারামারি হানাহানি ছিল না।

কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এম এন লারমার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর কাছে যখন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হল এবং বঙ্গবন্ধু সবাইকে বাঙালি হয়ে যাও বলে পরামর্শ দিলেন, তখন তো স্বাভাবিকভাবে যারা অবাঙালি তারা প্রশ্ন তুলবে। সেই অবস্থান থেকে ৭০ দশকের শেষ দিকে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। তারা নিজেদের অবস্থান আগে থেকেই পরিষ্কার করেছিল এবং তাদের ন্যায্য অধিকার দাবি তুলেছিল। কিন্তু তাদের কথা কেউ শোনেনি, একপ্রকার বাধ্য হয়ে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা সবাই জানি গত বছর ২৪-এর জুলাই আন্দোলনের কথা এবং ৭১-এর কথাও জানি, ৯০ অভ্যুত্থানের কথাও জানি, যেগুলি করে মানুষকে মেরে ফেলা যায় কিন্তু দমিয়ে রাখা যায় না। ঠিক সেইভাবে সরকার পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এটা পরেই বোঝা গেছে এটা প্রতারণা করা হয়েছে। কারণ চুক্তির মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি বা বাস্তবায়ন করতে দেয়া হয়নি। সবচেয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কমিশন গঠন করলে সেই কমিশন যাতে কাজ করতে না পারে তার প্রতিবাদ করার জন্য সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিদের রাস্তায় নামিয়ে দেয়া হয়।

আমরা যারা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলি, পার্বত্য চট্টগ্রামে বার বার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। একদিকে চুক্তির কথা বলা হচ্ছে, অপরদিকে বার বার চুক্তির লঙ্ঘন হচ্ছে। এগুলো কিন্তু মানুষকে হতাশ করে এবং এগুলোর রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

সিএইচটি কমিশন নামে একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম আছে, যেখানে আন্তর্জাতিক অনেক ব্যক্তি আছেন যারা মূলত মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে না কেনো, তার তদারকি এবং প্রতিবাদ করা। তারা একসময় সরকারের সাথে বসে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কথা বলতেন। কিন্তু তাদের পরবর্তীতে আর আসতে দেয়া হয়নি, ভিসা দেওয়া হয়নি এবং দেখা করতেও দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই কমিশনটাকে আর গ্রহণ করা হচ্ছে না। যদিও একসময় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই কমিশনের প্রধানের সাথে কথা বলেছেন।

পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যেহেতু এই কমিশনের বিদেশিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, আমরা কমিশনের বাঙালি সদস্যরা কমিশনের পক্ষ থেকে একটা সফরে যায়– খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি এবং বান্দরবানে। সফর শেষে ফেরার সময় 'সমঅধিকার আন্দোলন' নামে সেটেলার বাঙালিদের একটি সংগঠন অ্যাটাক করতে চেষ্টা করেছিল। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা রাঙ্গামাটিতে তিনদিনের সফরের দ্বিতীয় দিনে আবার এই বাঙালি সেটেলাররা আক্রমণ করে ভাঙচুর করে। তার আগের দিন আমরা কিন্তু আদিবাসীদের একটা কমিটি বা গ্রুপ আছে তাদের সাথেও বলেছি। কিন্তু হামলা যখন করা হলো, আমরা আমাদের কিভাবে বের করে আনবো এটা নিজেরাই ব্যবস্থা করেছি।

কমিশনের বাঙালি সদস্যরা কোনো বক্তব্যও দিতে পারেননি আর কোনো ভূমিকাও রাখতে পারেননি। আমি এটা কোনো নেগেটিভলি দেখছি না, আমি পজিটিভলি দেখছি এই কারণেই যে, একটা সংগঠন যারা সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তাদের এত দুর্বল করে রাখা হয়েছে যে, তারা কোনো বক্তব্য রাখতে পারেনি। প্রায় ৩০ বছর সংগ্রাম করে যারা রাষ্ট্রকে বাধ্য করেছে চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে, তারা কি এমন পর্যায়ে গেছে যে, আমাদের এখন ঘরে বসে এই আলোচনা করতে হচ্ছে। সরকার আদিবাসীদের নিজেরাই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিচ্ছে এবং বলছে যে চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এর সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

এখন আমাদের দায়িত্ব এই ঘটনা কারা করছে এবং কেনো হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা। তাদের বুঝাতে হবে নাগরিক হিসেবে এটা তাদের মৌলিক অধিকার। আদিবাসীরা তাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, প্রথা, রীতি-নীতি নিয়ে এই পাহাড়েই বেঁচে থাকার, টিকে থাকার জন্য লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্য এই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন জরুরি।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে: ডা: গজেন্দ্রনাথ মাহাতো,

সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

আমি শুভেচ্ছা জানাতে চাই আজকের পার্বত্য চুক্তির ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সেই সকল বক্তাদের যারা এই সভাকে প্রাণবন্ত করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সেই সকল শ্রোতাদের যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কষ্ট করে এসে এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

আপনারা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শুনেছেন। এই আলোচনার মধ্যে একটি কথা উঠে এসেছে যে আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া কোন কিছুই অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য আমাদের জাতীয় ঐক্য সুসংগঠিত করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সম্মানিত সুধিবৃন্দ প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধারণ করে আগামী দিনে আন্দোলন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে এই চুক্তিসহ বাংলাদেশের সকল আদিবাসীদের সকল দাবি দাওয়া বাস্তবায়নে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাবো। আরেকটি কথা বলতে চাই, পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে আগামী দিনে পার্বত্য শান্তি চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আবারো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি এবং আজকের এই সভা সমাপ্ত ঘোষণা করছি, সবাইকে ধন্যবাদ।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্র • ব • ন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র ২৮ বছর: একটি পর্যালোচনা

॥ অমর শান্তি চাকমা ও ত্রিজিনাদ চাকমা ॥

[এই প্রবন্ধটি গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঢাকার ধানমন্ডি উইমেন্স ভলান্টারি এসোসিয়েশন মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থাপিত হয়েছে]

ভূমিকা

আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'র ২৮ বছর পূর্তি। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যেকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিক এ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলা দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সময়ের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে। চুক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভূমি অধিকার সুরক্ষা, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করা। বহুজাতির, বহুসংস্কৃতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা গঠনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এ চুক্তিকে চিহ্নিত করা হলেও চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। বিশেষ করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের মত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন অত্যন্ত ধীরগতির। তবুও চুক্তি-উত্তর সময়ে সহিংসতা হ্রাস, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্গঠন চুক্তির আংশিক অগ্রগতির নির্দেশ করে। এদিকে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচনী ডামাডোলের বাস্তবতায় চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কার্যত বন্ধ হয়ে আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এমনতর প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তির বর্তমান বাস্তবতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একটি পাহাড়ি অঞ্চল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলটিতে ১৪ টি পাহাড়ি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী- পাংখুয়া, খুমী, লুসাই, ম্রো, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা, সাওঁতাল, গোর্খা ও অহমিয়া- সুপ্রাচীনকাল ধরে বসবাস করে আসছে। প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যর কারণে ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলটিতে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিলো (Mohsin, 2003)। তবে পাকিস্তান আমল থেকে সেই বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল, প্রথাগত শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, ১৯৬০ সালের জুম্ম বিধ্বংসী কাপ্তাই বাঁধ প্রভৃতির কারণে এই অঞ্চলের পাহাড়িদের মধ্যে অবিশ্বাস, বঞ্চনা ও অসন্তুষ্টির মাত্রা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেও নিরাপত্তা ও সমানাধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারী আচরণ পাহাড়িদের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা তীব্রতর করে (Barkat et al., 2009)। রাষ্ট্রীয় নীতিতে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতাকে অস্বীকৃতি, পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বসতিস্থাপন নীতি, বনভূমি বেদখল, সামরিক সম্প্রসারণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি ঘটনা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘস্থায়ী বৈষম্য ও অসন্তোষ তৈরি করে (Barkat et al., 2009)। এরই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ি জনগণ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা, ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিসহ রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতির অসামঞ্জস্যতা, প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা, সামরিক দমননীতি, সাম্প্রদায়িক হামলা সর্বোপরি পাহাড়িদের স্বতন্ত্র পরিচয়কে উপেক্ষা প্রভৃতি বিষয় এই অঞ্চলে একটি জটিল রাজনৈতিক সংকট তৈরি করে (Chakma, 2015)। এই বাস্তবতায় সরকারের অনীহা ও ক্রমাগত দমননীতির ফলে এ আন্দোলন ধীরে ধীরে সশস্ত্র রূপ নিতে শুরু করে (Levene, 1999)। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সামরিক শাখা গঠিত হয় এবং তারা

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, ভূমি ও অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিরোধ শুরু করে (PCJSS, 2025)। যার ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনমানুষের মধ্যে একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক অচলাবস্থার তৈরি হয়। পাহাড়ি জনগণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য নয়, তারা লড়ছিল তাদের নিজস্ব পরিচয়, ভূমি অধিকার ও সাংস্কৃতিক মর্যাদার জন্য। জুম্ম জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এ আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করে তোলে। এই অবস্থায় একদিকে সংঘাতের মানবিক ও নিরাপত্তাজনিত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নজরদারি ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভূরাজনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে (Levene, 1999)। যার ফলে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ দশকের শেষ দিকে এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে শুরু করে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ অক্টোবর। দ্বিতীয় বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ঐতিহাসিক ৫ দফা দাবিনামা তৎকালীন সরকারের নিকট পেশ করে। এভাবে বিভিন্ন সরকারের সাথে দীর্ঘ ২৬টি বৈঠকের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (PCJSS, 2025)।

চুক্তির বর্তমান বাস্তবতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দীর্ঘ ২৭টি বছর পেরিয়ে আজ ২৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এক প্রতিবেদনে সরকার দাবি করেছে চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৬৫টি পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে (The Daily Star, 2024)। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বলছে ৭২ টি ধারার মধ্যে শুধুমাত্র ২৫ টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৮টি আংশিক এবং বাকি ২৯টি এখনও সম্পূর্ণ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে (PCJSS, 2025)। এছাড়াও জনসংহতি সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি গত ১২ জানুয়ার ২০২৫ গঠন করা হলেও এখন অবধি গত ১৯ জুলাই ২০২৫ মাত্র একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (Prothomalo, 2025)। বৈঠকের পরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভয়েস অফ আমেরিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বলেন- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে তার সরকার পেরে উঠবে না, এটা পরবর্তীতে নির্বাচিত সরকার দেখবে। অন্যদিকে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের *Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)*-এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ঘোষণা করেন যে, 'সরকার চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ' (MoFA, 2025)। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন, মানবাধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা এক ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করে। জনসংহতি সমিতির ২০২৫ সালের অর্ধবার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থাপিত নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, সেনাবাহিনী-সমর্থিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং ভূমি বেদখলকারী কর্তৃক মোট ১০৩ টি মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটিত হয়েছে। এই সকল ঘটনায় ৩১৫ পাহাড়ি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। ৩০০ একর জমি বহিরাগত কোম্পানী বা প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা দখল করা হয়েছে (PCJSS, 2025)। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ঘটতো না, বরং নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেকাংশে উন্নত হতো বলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মত। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘোষণা দিলেও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা আগের মতই ধীরগতির। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রধান স্তম্ভ আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদে ক্ষমতায়ন, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকরণ, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে পাহাড়িদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ করা, জুম্ম জনগণের নিরাপত্তা ও সামাজিক আস্থা গঠনের ব্যবস্থাসহ চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখেছে সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরী

শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ক গবেষক Roger MacGinty এবং John Darby-এর মতে, শান্তি শুধুমাত্র চুক্তি বা অস্ত্রবিরতির মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটি একটি বহুস্তরীয় সমন্বিত প্রক্রিয়া। সমকালীন এই গবেষকদের ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরী অনুসারে, শান্তি চুক্তি সফল করতে হলে প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন- এই তিনটি উপাদানকে সমন্বিতভাবে কার্যকর করতে হবে (Darby & MacGinty, 2003)। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ছিল পাহাড়ে শান্তি আনয়নের জন্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এটির মধ্যে দিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সময় ধরে চলা রাজনৈতিক আন্দোলন

এবং সংঘাতময় অস্থিরতার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। সরকারের বিভিন্ন সূত্রমতে পার্বত্য চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬৫ টি ধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে বাকি ধারাগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে এবং সরকার এ চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চুক্তির অপরপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি দাবি করছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তির অন্যপক্ষ সরকারের কোনরূপ ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। বরং চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য এবং পাহাড়িদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র পাহাড়ে বিভিন্ন সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরি করছে, জুম্মদের ভূমি অধিগ্রহণ করছে, রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনে মদদ দেওয়া হচ্ছে (PCJSS, 2025)। এমনতর বাস্তবতায় Roger MacGinty এবং John Darby-এর ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরি'র তিনটি উপাদানের আলোকে স্বাক্ষরের দীর্ঘ ২৮ বছর পরে চুক্তি বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-

প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম প্রধান বিষয় হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতায়ন। স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামো সংস্কারের উদ্দেশ্যে চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু যে আইনের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক পরিষদ দাঁড়িয়ে থাকবে সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ কার্যকর করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য ১৯০০ সালের শাসনবিধি, ১৮৬১ সালের পুলিশ এ্যাক্ট ও ১৯২৭ সালের বন আইনসহ অন্যান্য আইনসমূহ অদ্যাবধি সংশোধন করা হয়নি। চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন না হওয়ায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি (PCJSS, 2025)। পক্ষান্তরে এক রিটের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-কে অবৈধ ও সংবিধানবিরোধী ঘোষণা করে হাইকোর্ট থেকে রায় দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের আপিল ডিভিশন হাইকোর্টের সেই রায়কে স্থগিত ঘোষণা করে দেয় এবং সেই থেকে আজ অবধি আপিল বিভাগে শুনানির জন্য পড়ে রয়েছে (Jagonews24, 2018)। শুধু তাই নয়, চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা থাকলেও জেলা-উপজেলা পর্যায়ের পুলিশ বিভাগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডেপুটি কমিশনার তথা স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে সেই বিধানটি কার্যকর করা যাচ্ছে না (PCJSS, 2025)। সর্বোপরি, আঞ্চলিক পরিষদের কাছে প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুষ্ঠু তদারকি করতে পারছে না।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারাসমূহের পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ করা হয়। স্থানীয় সরকার পরিষদ পরিবর্তন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ নাম সংযোজিত হয়। এছাড়াও স্থানীয় পর্যটন, কৃষি সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রভৃতি বিভাগও চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে হস্তান্তর করা হয়। তবে মৌলিক বিষয় ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং স্থানীয় পুলিশ বিভাগটি হস্তান্তর না করার কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়েছে (PCJSS, 2025)। একদিকে বাঙালি সেটেলারদের এক পক্ষের বিরোধিতা এবং অন্যদিকে প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকার কারণে সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াটি স্থগিত করতে বাধ্য হয় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। এছাড়াও জেলা পরিষদসমূহে নির্বাচন না হওয়ার ফলে ক্ষমতাসীন দল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। যার ফলে জনসাধারণের কাছে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন না।

অন্যদিকে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন গঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি অর্জন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে এ কমিশনটির গঠন হয়ে থাকে। ১৯৯৯ সাল হতে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন গঠন হয়ে আসছে। ২০০১ সালে এ কমিশনটির আইন প্রণীত হয়। ২০১৬ সালে জাতীয় সংসদে আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলোকে সংশোধন করে কমিশনটির বিধিমালা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার এখনো সেই বিধিমালা চূড়ান্ত না করার ফলে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কাজ এখনো শুরু করা যায়নি। এদিকে বিভিন্ন সময়ে এ কমিশনের সভা আহ্বান করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের চুক্তিবিরোধী পক্ষ এবং সেটেলারদের প্রতিবাদ তথা প্রশাসনের অসহযোগিতার কারণে অনেক বার এ সভা বাতিল করতে হয়। সর্বোপরি, কমিশন গঠন এবং আইন প্রণয়ন করা হলেও

সরকারের অসদিচ্ছার ফলে বিধিমালা চূড়ান্তকরণ, পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ এবং তহবিল ও পরিসম্পদ বরাদ্দ করা হয়নি। প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকার কারণে এ কমিশনটির কার্যক্রমও কার্যত অচল হয়ে আছে। Darby তার Violence: Post-Accord Problems During Peace Processes-এ দেখিয়েছেন, যখন ক্ষমতা বাস্তবে হস্তান্তরিত না হয় তখন শান্তি কাগজে থাকে, বাস্তবে নয় (Darby, 2005)। সুতরাং, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক উপাদান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে চুক্তি অনুযায়ী কার্যকর প্রশাসনিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন

ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরী অনুযায়ী আস্থা, বিশ্বাস হলো টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের মাধ্যমে যথাযথ ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় (Darby & MacGinty, 2003)। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ২২টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে (PCJSS, 2025)। জুলাই অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় ৪ জন পাহাড়ি নিহত হয় এবং আহত হয় আরো ১০১ জন। এছাড়াও রাঙ্গামাটিতে ২৪টি এবং খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় ৫২টি ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৯৮-২০১১) এবং কাপেং ফাউন্ডেশন (২০১২-২০২৪)-এর তথ্য অনুযায়ী বিগত ২৭ বছরে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন সর্বমোট ৯,১৬২ জন পাহাড়ি। এসবের মধ্যে নারী ও শিশুর উপর হয়েছে ৫১৩ টি। ভূমিদস্যু কর্তৃক ভূমি জবরদখল করা হয়েছে ৫,৯৬৬ একর এবং ২,৮১৪ টি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্যাম্প স্থাপনের নামে ৩১৬ একর ভূমি এবং ২,২০৫ একর জায়গা দখলের জন্য ভূয়া দলিল তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এসকল ঘটনার একটিরও সুষ্ঠু ও ন্যায্য বিচার হয়নি (IPNEWS BD, 2025)।

শুধু তাই নয়, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫, ঢাকা শহরের রাজপথে স্টুডেন্ট ফর সভারেন্টি নামের একটি ভূঁইফোড় সংগঠন কর্তৃক আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর নির্মমভাবে হামলা করা হয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও তাদেরকে জামিনে ছেড়ে দেওয়ার খবর পাওয়া যায়। এছাড়াও ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে বান্দরবানের রুমা এবং থানচি উপজেলায় কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) কর্তৃক ব্যাংক ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বম জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদেরকেও এখন অবধি বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে। এবং কারাগারে থাকা অবস্থায় ইতিমধ্যেই ৪ জনের মৃত্য ঘটেছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করে ৬ টি ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ১০৫ টি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ৩০ টির অধিক ক্যাম্প আবারো পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। তদুপরি সাম্প্রতিক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের একটি সংগঠন পাহাড়ে আরো ২৫০ টি সেনাক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানিয়েছে। 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী রাখা হয়েছে (PCJSS, 2025)। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ বছর হলেও চুক্তির প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। এ সকল বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উল্লেখিত ঘটনাগুলোর একটিরও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ বিচারের মাধ্যমে আসামীরা শাস্তি পায়নি। এরই প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনসহ সরকার ও রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কতটুকু বিরাজ করছে তা সন্দেহের বিষয়।

ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরি'তে আরো বলা হয়েছে, প্রশাসনে নিরাপত্তাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি থাকলে শান্তি প্রকল্পগুলো স্থানীয় মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না (Darby & MacGinty, 2003)। সুতরাং, সরকার এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এমনতর বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের পাশাপাশি সেনাশাসনের অবসান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গঠন করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরি'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিচালনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ। Darby & MacGinty বলেন– *"peace collapses when institutional reforms fail to integrate marginalized groups into decision-making structures"* (Darby & MacGinty, 2003)। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম একটি ধারা ছিলো চুক্তি-পূর্ব সময়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে

যাওয়া পাহাড়িদের সম্মানজনকভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। চুক্তির এ বিধান অনুযায়ী প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ১২,২২২ টি পরিবারকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হলেও ৯,৭৮০ টি পরিবার তাদের ভিটেমাটি ও জায়গা-জমি ফেরত পায়নি। ফেনী উপত্যকার মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি ও রামগড় উপজেলা, মাইনি উপত্যকার দিঘীনালা ও চেঙ্গী উপত্যকার মহালছড়ি উপজেলা এবং মাইনী ও কাচালং উপত্যকার লংগুদু উপজেলায় অবস্থিত ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০ টি গ্রাম, ভিটে-মাটি ও জায়গা জমি এখনো সেটেলাররা দখল করে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি বাজার ও ৭টি বিহার পুনর্বহাল করা হয়নি। রেশন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রয়েছে ৫৪ হাজার শরণার্থী। অন্যদিকে চুক্তি মোতাবেক ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু জুম্মদের জন্য গঠিত টাস্কফোর্স কমিটিতে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে একতরফাভাবে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক দাখিলকৃত ১,৪২৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, চুক্তির ধারা অনুযায়ী সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত পাহাড়িদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করার কথা বলা হলেও গত ৪ অক্টোবর ২০১৮ প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে সকল প্রকার কোটা বাতিল করা হয়। এতে করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সরকারি চাকরিতে যোগদানের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদে স্থানীয় পর্যটন বিষয়টি হস্তান্তর করা হলেও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বা অন্য সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কোন দপ্তর ও পর্যটন কেন্দ্র পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যার ফলশ্রুতিতে সরকারি, বেসরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলায় রিসোর্ট, পর্যটন কেন্দ্র, হোটেল-মোটেল নির্মাণসহ নানা প্রকল্পের মাধ্যমে জুম্মদের ভূমি কেড়ে নিচ্ছে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হলেও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি (PCJSS, 2025)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র ২০২২ এর মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে পাহাড়ি-বাঙালির অনুপাত ৪৯.৯৪ ঃ ৫০.০৬ হয়ে দাঁড়িয়েছে (BBS, 2022)। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ ও ১৯৫১ সালের আদমশুমারীতে স্থায়ী বাঙালির হার ছিলো যথাক্রমে ২.৯৪% ও ৬.২৯%। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমিতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসনের ফলে ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে এ হার বেড়ে যথাক্রমে ৪১.২৩% ও ৪৮.০৬% হয়ে যায়।

এছাড়াও চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হলেও মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী নিয়োগের বেলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়না। মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী না হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে সংবেদনশীল নন। এমতাবস্থায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি কৃষ্টি, ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম তিনটি শর্ত হচ্ছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিচয়, ভূমি, সংস্কৃতি ও ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় স্থানীয়দের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা, পারস্পারিক সম্পর্ক ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। চুক্তি পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক এ সকল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, বরং বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ করা, সম্প্রদায় ও জাতিভিত্তিক বিভাজন তৈরি প্রভৃতি বিষয়গুলো সূক্ষ্মভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সুপারিশমালা

ইন্টিগ্রেটেড পিস থিওরী'র আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও সমস্যাসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী ও টেকসই শান্তি এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে–

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্তম্ভ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে চুক্তি মোতাবেক প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

২) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে অহস্তান্তরিত বিভাগগুলো দ্রুত হস্তান্তর করা।

৩) ভূমি কমিশনকে যথাযথ ক্ষমতায়ন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং এ লক্ষ্যে ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করা।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক তিন

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা।

৬) অপারেশন উত্তরণ'সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার পূর্বক স্থায়ী ক্যান্টনমেন্টে ফেরত নেওয়া।

৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে স্থানীয় পাহাড়িদের অগ্রাধিকার দেওয়া।

৮) সর্বোপরি, পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চল ও পাহাড়ি কৃষ্টি, সংস্কৃতি সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উপসংহার

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ যুগের পর যুগ ধরে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ব্রিটিশ প্রশাসনের উপেক্ষা, পাকিস্তান সরকারের প্রথাগত শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ও জুম্ম বিধ্বংসী কাপ্তাই বাঁধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিগত অস্বীকৃতি তাদেরকে রাষ্ট্র থেকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সাংবিধানিক অস্বীকৃতি, ভূমি বেদখল, জাতিগত হামলা, জনমিতি পরিবর্তনসহ রাষ্ট্রীয় শোষণ, বঞ্চনা জুম্ম জনগণকে প্রতিবাদী করে তোলে। তারই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগের অধিক আন্দোলন সংঘাত এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এই সংঘাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত করে একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার হিসেবে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। তবে চুক্তির ২৮ বছর হলেও মৌলিক বিষয়গুলো এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে ক্ষমতা হস্তান্তর, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি, স্থানীয় ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন, অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। যার ফলে চুক্তির কাঙ্খিত ফলাফল এখনো ভোগ করতে পারেনি পার্বত্য জনগণ।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংঘর্ষ বিষয়ক গবেষক Darby I MacGinty তাদের *Contemporary Peace Making: Conflict, Violence and Peace Processes*-তে বিশ্লেষণ করেছেন, শান্তি প্রক্রিয়া কোনো সরল রৈখিক প্রক্রিয়া নয়; বরং বহুমাত্রিক কাঠামোর সমন্বিত প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। এই ধারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র অস্ত্রবিরতি বা রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে শান্তি আনয়ন সম্ভব নয় বরং প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জন, এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসই শান্তি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে চুক্তি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা শান্তি প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে এবং উক্ত অঞ্চলে আবারো চুক্তি-পূর্ব উত্তেজনা ও সংঘাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, দ্রুত রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র এবং সরকার উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হবে।

তথ্যসূত্র

Barkat, A., Halim, S., Poddar, A., Badiuzzaman, M., Osman, A., Ullah, M. and Chakma, S. (2009) Socio-economic baseline survey of Chittagong Hill Tracts. Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Ministry of Chittagong Hill Tracts Affairs.

Bangladesh Bureau of Statistics. 2023 Population and Housing Census 2022. Dhaka: Government of the People's Republic Bangladesh. Available at: https://bbs.gov.bd/site/page/47856ad0-7e1c-4aab-bd78-892733bc06eb/Population-and-Housing-Census (Accessed: 29 November, 2025).

Chakma, B. (2015) 'The politics of state-making in the Chittagong Hill Tracts', Asian Ethnicity, 16(2), 241–259.

Darby, J. & Mac Ginty, R. (2003) Contemporary Peace Making: Conflict, Violence and Peace Processes. London: Palgrave Macmillan

Darby, J. (2005) Conflict in Northern Ireland: The development of a contemporary understanding. London: Macmillan.

IP NEWS BD. *(২০২৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, পার্বত্য চুক্তি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ঢাকায় দিনব্যাপী আলোচনা সভা.* Available at: https://ipnewsbd.net/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF/ (Accessed: 29 November 2025).

JagoNews24. *(২০১৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের আপিল শুনানি পিছিয়েছে.* Available at: https://www.jagonews24.com/law-courts/news/402823 (Accessed: 1 December 2025).

Levene, M. (1999) 'The Chittagong Hill Tracts: A case study in the political economy of "creeping" genocide', Third World Quarterly, 20(2), pp. 339–369.

Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh. (2025) Bangladesh reaffirms commitment to fully implement the CHT Peace Accord. Available at: https://nypm.mofa.gov.bd/en/site/press_release/Bangladesh-reaffirms-commitment-to-fully-Implement-the-CHT-Peace-Accord (Accessed: 27 November 2025).

Mohsin, A. (2003) The Politics of Nationalism: The Case of the Chittagong Hill Tracts. UPL.

Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS). (2025) CHT Accord Report. Available at: https://www.pcjss.org/cht-accord-report/ (Accessed: 1 December 2025).

Prothom Alo. (2025) *পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির বৈঠক শুরু.* Available at: https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/6ppr96ag2f (Accessed: 29 November 2025).

The Daily Star. 2024 27yrs of CHT peace accord: Key promises still unfulfilled. Available at: https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/27yrs-cht-peace-accord-key-promises-still-unfulfilled-3766361 (Accessed 30 Nov. 2025).

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

জুম্ম বিরোধী অপপ্রচারঃ প্রকাশ্যে ছড়ানো হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যাচার

॥ সজীব চাকমা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ বিচার ও যথাযথ সমাধানের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সত্যকে গ্রহণ এবং বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণে অস্বীকৃতি। যে কারণে তারা বরাবরই হয় মনগড়া অথবা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ধারণা ও ভাষ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ফলে সমস্যার ফলপ্রসূ আলোচনা এবং যথাযথ সমাধান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুদূরপরাহত থেকে যায়। সরকার ও নীতিনির্ধারকরা বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে মিথ্যা ও বানোয়াট বয়ানের অবতারণা বা অবলম্বন করেন। বর্তমানের অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে এবং অগুণিত মিথ্যা, বিকৃত, বানোয়াট তথ্যপ্রবাহের জোয়ারে সঠিক, বাস্তব ও উপযুক্ত তথ্য এবং সঠিক ও নিরপেক্ষ ভাষ্য পাওয়া এবং জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে সুপরিকল্পিতভাবে জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী অপপ্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। যা জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে পরাধীন ও বিলুপ্ত করার পথকে ত্বরান্বিত করছে। যা শান্তির বদলে অশান্তি, সম্প্রীতির বদলে সহিংসতা, জ্ঞানের বদলে অজ্ঞানতার দিকে ধাবিত করছে।

চুক্তির আগে

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ব পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ বাস্তবতা এবং আদিবাসী জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও তাদের স্বাধিকারের দাবির বিষয়ে সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর ভাষ্য ও প্রচার বিষয়ক অবস্থান ছিল প্রধানত অস্বীকারকরণ, অস্বীকৃতি, উপেক্ষা প্রদর্শন, সবাই বাঙালি বলে চালিয়ে দেওয়া, অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং তৎপরবর্তী পশ্চাদপদ অঞ্চল, উপদ্রুত অঞ্চল, রাষ্ট্রবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী আন্দোলন বলে উপস্থাপন। এরপর আরো যুক্ত হয়- স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ এলাকা, বিস্তর খালি জায়গা, লোকসংখ্যা নগণ্য (যার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত বাস্তবতাকে আড়াল করে সমতল থেকে বাঙালি নিয়ে এসে জুম্মদের বসতি দখল করা, জুম্মদের বসতভিটা থেকে বিতারণ, জুম্মদের সংখ্যালঘু করা, তাদের রাজনৈতিক সহ অন্যান্য অধিকার কেড়ে নেওয়া বা খর্ব করা)।

তাই স্বাধীনতার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা যখন নিজেদের আত্মপরিচয়, জাতীয় অস্তিত্ব ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে কথা বলতে শুরু করে, তখন সরকারের পক্ষ থেকে একধরনের মনগড়া ও ভিন্ন বয়ান প্রচার শুরু করা হয়। তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী জুম্মদের যেমন বাঙালি বা বাঙালি জাতির উপ-জাত হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়, তেমনি দেশে যে বাঙালি ছাড়াও ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষ রয়েছে সেটা দেশের জনগণকে এবং বহির্বিশ্বে যতদূর সম্ভব অন্ধকারে রাখার সুক্ষ্ম চেষ্টাও চলে। একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও দিকনির্দেশনা হিসেবে যে সংবিধান থাকে, সেখানেও ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। অপরদিকে জুম্মরা যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের স্বশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে, সেখানে সরকার পার্বত্য সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা, জুম্মদের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসী আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরে।

তৎকালীন সময়ে এটাও অনেকের কাছ থেকে শোনা গেছে যে, সেনাবাহিনীর নতুন রিক্রুটদের বিশেষত বাঙালি সৈনিক বা অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় জুম্মদেরকে বা শান্তিবাহিনীর সদস্যদেরকে বর্বর, হিংস্র এবং শত্রু হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই প্রশিক্ষণের সময় থেকেই নতুন সেনা সদস্যদের মাথায় জুম্মদেরকে তাদের শত্রু বলে শিক্ষা দেওয়া হয়। এটার সত্য, মিথ্যা প্রমাণ এই মুহূর্তে নেই। কিন্তু এটা লেখক নিজেই বিভিন্ন জনের কাছ থেকে এমন বিবরণ শুনেছেন।

উল্লেখ্য যে, সরকার, শাসকগোষ্ঠী ও জুম্ম বিদ্বেষী গোষ্ঠীর পাশাপাশি এরশাদের সামরিক শাসন বিরোধী গণআন্দোলনের সুবাদে দেশে একটি প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক চেতনার জনশক্তিও বিকাশ লাভ করে। যারা পার্বত্য সমস্যাকে, জুম্মদের আন্দোলনকে ও অধিকারকে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এসময় তারা সভা, সমাবেশে, সেমিনারে, গণমাধ্যমে, লেখালেখিতে, গবেষণায় জুম্মদের আন্দোলকে ন্যায্য অধিকারের আন্দোলন, অপরদিকে সরকারের পদক্ষেপকে দমন-পীড়নমূলক বলে উল্লেখ করে পার্বত্য সমস্যাকে জাতীয়

ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে, এর সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান দাবি করে। এসময় জুম্মদের আন্দোলনের স্বপক্ষে বাঙালি সমাজের পক্ষ থেকে যথেষ্ট লেখালেখি এবং আলোচনা শুরু হয়। এদের মধ্যে বিশেষ করে সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, উন্নয়নকর্মী, বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বলতে গেলে, সেই সময় প্রবল সামরিক শাসনের যুগেও দেশের সাধারণ বাঙালিরা পাহাড়ের মানুষকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার দৃষ্টিতেই দেখতেন। পাহাড়ে প্রতিনিয়িত সেনাবাহিনীর নিপীড়নের ভয় থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে গেলে সাধারণ বাঙালিরা জুম্মদেরকে আন্তরিকতাই প্রদর্শন করতেন। এই সম্প্রীতির পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরেও নিশ্চয়ই একটা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

মিথ্যা ও বিদ্বেষ ভরা অপপ্রচার

সাম্প্রতিক কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচারযন্ত্রের অভাবনীয় অগ্রগতির এই যুগে এসে এই অপপ্রচার আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সেই সাথে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পাঁচ দশকে যে হারে মুক্তিযুদ্ধের মূলনীতির চেতনার অবক্ষয় হয়েছে এবং অপরদিকে সমাজে, রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, প্রতারণা, কায়েমি স্বার্থ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা যেন এইসব হিংসাত্মক অপপ্রচারের জন্য জল-সার যোগাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ওয়েবসাইট, ভ্লগিং, ইউটিউব ইত্যাদি অনলাইন মাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত বা অপব্যবহার হচ্ছে। এই অপপ্রচারের ধরন ও ভাষ্য দেখে এটা স্পষ্ট যে, এসবের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে বিরোধীতা করা এবং নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা, আদিবাসী পরিচয়কে রাষ্ট্রবিরোধী বলে তুলে ধরা, জুম্মদের হেয়প্রতিপন্ন করা, মর্যাদাহানি করা, সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরা, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত সমস্যাকে সম্পূর্ণ খণ্ডিত করে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত ও ভুলভাবে তুলে ধরা। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার বিষয়ে একটা বিরাট বিভ্রান্তির জট তৈরির চেষ্টা চলছে। পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে সমস্যাটির যে একটা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ সৃষ্টি হয় সেটাকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই সমস্ত অপপ্রচারকারীরা প্রতিনিয়ত জাতীয় সংহতিতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। পার্বত্য চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, আদিবাসী ইস্যু, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং আদিবাসী জুম্মদের ইতিহাস, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রথাগত নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেশ কিছু অনলাইন গণমাধ্যম, ফেসবুক পেইজ, ভ্লগ, ইউটিউব একাউন্ট নানা মিথ্যা, বিকৃত ও ভিত্তিহীন তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষমূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সেগুলির অনেক ভাষ্য ও বাক্য এখানে পরিবেশনযোগ্য নয়। নিম্নে এরকম কিছু অপপ্রচারযন্ত্রের উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুপরিকল্পিত এবং সক্রিয় অনলাইন গণমাধ্যম হল– পার্বত্যনিউজ। এটি একটি রেজিস্টার্ড নিউজ পোর্টাল। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এটির মূল উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে এটি সক্রিয় রয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে জুম্মদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, জুম্মদের আন্দোলনের বিপক্ষে নানা প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এটি সবসময় সেনাবাহিনীর গুণগান গায় এবং সেটেলাররে স্বার্থে কথা বলে থাকে। সেনাবাহিনী ও সেটেলাররা যদি জুম্মদের উপর হামলা, জুলুম চালায়, এমনকি খুন করলেও মাফ করে দেয়, টু শব্দটি করে না। এই অনলাইন পোর্টালে প্রায়ই পার্বত্য চুক্তিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরা হয়, জুম্মদের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসী আন্দোলন, বিদেশি ষড়যন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং আদিবাসী ইস্যুর বিষয়ে যা নয় তা, জুম্মদের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করে তুলে ধরা হয়। বলা যায়, এটি সম্পূর্ণভাবে জুম্মদের জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী একটি প্রচারমাধ্যম।

সেটেলার বাঙালি ছাত্রদের সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি)-এর 'পিসিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটি' নামে একটি ফেসবুক পেইজ রয়েছে। এটিও সবসময় পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন হলে বা জেলা পরিষদের নিয়োগ হলে তাতে তাদের লোক সদস্য হিসেবে নিয়োগ পেতে এবং চাকরিতে আসন বরাদ্দ বেশি পেতে তদবির শুরু করে বা বিক্ষোভ করে। অথচ এই পেইজ থেকে প্রতিনিয়ত চুক্তির বাতিল দাবি করা হয়, জুম্মরা জুম্মল্যান্ড গঠনের পরিকল্পনা করছে বলে বানোয়াট তথ্য প্রচার করা হয়। সম্প্রতি প্রচারিত একটি সংক্ষিপ্ত লেখায় বলা হয়, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কথিত জুম্মল্যান্ড নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে।' এছাড়াও এই পেইজে জুম্ম বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, নাগরিকদের নিয়ে অত্যন্ত অরুচিকর নানা লেখা ছবিসহ পোস্ট করা হয়। এদের প্রচারে হীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'পাহাড়ের গল্প' নামে একটি পেইজে ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে 'ইয়েন ইয়েনকে নিয়ে প্রশ্ন' শিরোনামে এক পোস্টে

লেখা হয়, 'সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ের অস্থিরতা, বিভাজন আর বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠার পেছনে একটি নাম ঘুরেফিরে আসছে- চাকমা রাণী ইয়েন ইয়েন।' ১ ডিসেম্বর ২০২৫ এই পেইজে লেখা হয়েছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম আলাদা করার স্বপ্ন কখনো সফল হয়নি, হবেও না।' অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে কেউ কখনো আলাদা হওয়ার ডাক দেয়নি। তবুও দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য এইসব কথা প্রচার করা হয়।

আরেকটি পেইজ দেখা যায় Save Cht Save BD নামে। এটি চরম উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষপূর্ণ একটি পেইজ। ২১ জানুয়ারি ২০২৬ এর প্রচার করা একটি পোস্টের শিরোনাম হচ্ছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালিদের বিতাড়িত করতে উঠেপড়ে লেগেছে সন্তু লারমা ও উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।' এই পোস্টে জুম্মদের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সন্তু লারমা ও সুপ্রদীপ চাকমার মাথায় শিং এঁকে দিয়ে প্রচ্ছদ ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে আরও লেখা হয়েছে, 'যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলা– খাগড়াছড়ি, বান্দরবান থেকে বসবাসরত বাঙালি নাগরিকদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্সার্জেন্সীতে লিপ্ত থাকা আঞ্চলিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলগুলো।' এই লেখায় আরও নানা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ও তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই পেইজ কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে একটি পোস্টে লেখা হয়, 'উগ্র চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা।'

Save CHT নামে একটি পেইজ আছে, এটিও কেবল জনসংহতি সমিতি ও জুম্মদের বিরুদ্ধে নানা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার করে। ২ জানুয়ারি ২০২৬ এই পেইজে লেখা হয়েছে– 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের জায়গা নয়, রাষ্ট্রদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী নির্মূলে চাই চূড়ান্ত সামরিক অভিযান'। এই পেইজে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রামের মাল্যা গণহত্যা নিয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বয়ান উপস্থাপন করা হয়। এতে এমনভাবে তুলে ধরা হয়, যেন জুম্মরাই এই নৃশংস গণহত্যা চালায়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কাচালং নদীর তীরবর্তী মাইল্যা নামক স্থানে বোটে একটি বোমা বিস্ফোরণ হলে এক যাত্রী নিহত হন। এরপর ভয়ে সবাই নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে তীরে ওঠার চেষ্টা করেন। এসময় সেটেলার বাঙালিরা প্রায় ৩০ জন জুম্মকে হত্যা করে।

Save Chittagong Hill Tracts নামে পেইজটি ৪ জানুয়ারি ২০২৬ লিখেছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের নামে সরকারি ও পর্যটনের জায়গা দখল পাহাড়ি সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর'।

Speak Tru Cht নামে আরেকটি ফেসবুক একাউন্ট ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ 'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ' নামের আরেকটি একাউন্টের পোস্ট শেয়ার করে। ঐ পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমন করেছে আদিকাল থেকে। অপরদিকে, ত্রিপুরা ব্যতীত চাকমা, মারমা সহ অন্যান্যদের আগমন দেখানো হয়েছে ১৬শ-১৭শ শতকের দিকে। অথচ প্রকৃত ইতিহাস বলে যে, ১৮শ সালের প্রথম দিকে চাকমা রাজাই সর্বপ্রথম কিছু বাঙালি চাষী পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়ও বাঙালি জনসংখ্যা ছিল পাহাড়ির তুলনায় ১.৫ শতাংশ মাত্র। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ চাকমা রাজা ও রাণীকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে লিখেছে, 'পদ, পদবী আর ব্যক্তি স্বার্থে দেবাশীষ রায় ও ইয়ান ইয়ান স্বজাতিকে ব্যবহার করছে'। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে এই ফেসবুক একাউন্টের এক পোস্টে জুম্মদের পক্ষে সোচ্চার বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, খুশী কবির, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, স্বপন আদনান-সহ আরো কয়েকজনকে উদ্দেশ্য করে অসৌজন্যমূলক ও হুমকিমূলক কথা বলা হয়।

'পাহাড়ের খবর-Paharer Khobor নামে পেইজটিও অনুরূপ উগ্রসাম্প্রদায়িক এবং জুম্ম বিরোধী প্রচার করে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ এই পেইজটি একটি পোস্টে লিখেছে, বিজয়ের মাসে রাজাকার বধু ও উগ্র সাম্প্রদায়িক ইয়ান ইয়ান পেল হিউম্যান রাইটস পুরস্কার।

এছাড়া 'পাহাড় থেকে বলছি', 'পাহাড় তথ্যচিত্র', 'Md Almamun', 'জাগ্রত পাহাড়-Jagrata pahar', 'CHT Times 24', 'Hill Documentary', A H M Faruk প্রভৃতি বহু ফেসবুক পেইজ রয়েছে, যেগুলো প্রতিনিয়ত জুম্মদের সম্পর্কে, জুম্ম নেতাদের সম্পর্কে, তাদের অধিকার ও ইতিহাস সম্পর্কে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। যেগুলো দেশের জনগণকে এবং নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। এই পেইজগুলো অধিকাংশই সেটেলার বাঙালি ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর লোকজন পরিচালনা করে থাকেন বলে ধারণা রয়েছে। ধারণা করা যায়, একটি বিশেষ গোষ্ঠী এইসব পেইজের মালিকদের পেছনে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে থাকে।

অপপ্রচারের নেপথ্যে

এটা শুরু হয় মূলত পার্বত্য চুক্তির ৪/৫ বছর পর সেনাবাহিনীর উদ্যোগে, যখন চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড জোরদার করে। তবে জরুরি অবস্থার পরই সেনাবাহিনী যেন এক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজে নেমে পড়ে। ২০০৭-০৮ সালে জরুরি অবস্থা জারির পরপরই রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে নোটিশ দিয়ে জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের মুখপত্র 'জুম্ম সংবাদ বুলেটিন' প্রকাশ ও প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এভাবে ঐ সময়ে জুম্মদের অন্যতম কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করে দিয়ে কেবল সেনাবাহিনীর বয়ানই জারি রাখা হয়।

২০০৭-২০০৮ সালের জরুরি অবস্থার পর ২০০৯ সালে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো কার্যকর উদ্যোগ দেখায়নি। পক্ষান্তরে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়েছে যে, সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই সুবাদে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একপ্রকার সর্বময় ক্ষমতা লাভ করে। তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আদিবাসী ইস্যু নিয়ে সেনাবাহিনী একদিকে যেমন দেশের জাতীয় গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে বা হস্তক্ষেপ করতে থাকে, অপরদিকে সেনাবাহিনী পেছনে থেকে অসংখ্য অনলাইন বা ছাপানো সংবাদমাধ্যমের জন্ম দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের গণমাধ্যমগুলো এবং গণমাধ্যমকর্মীরা তো কাজেই সর্বদা সেনাবাহিনীর নজরদারি ও খবরদারির মধ্যে থাকেই।

এমনই এক পরিস্থিতিতে রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনীর ব্রিগেডে ও জোনে জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের প্রায় নিয়মিত ডাকা হতো বলে তথ্য রয়েছে। সাংবাদিকরা ব্রিগেডে বা জোনে আসলে সেনা কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের ফোন বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং সাংবাদিকতা বিষয়ে ব্রিফিং দিতেন। সেনাবাহিনী বা সেটেলারদের বিরুদ্ধে কোনো কথা লেখা যাবে না বলে নির্দেশনা দেওয়া হতো সাংবাদিকদের। এমনকি কোনো কোনো সাংবাদিককে মৃত্যুর হুমকি প্রদানের কথাও জানা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ করে মেজর তানভির নামে এক সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বস্তুত এখন জুম্ম বিরোধী এবং পার্বত্য চুক্তি ও পার্বত্য সমস্যা বিষয়ে যে অপপ্রচারের মহীরূহ সৃষ্টি হয়েছে তা সেনাবাহিনী ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর মদদেই সম্ভব হয়েছে। এবং সেটা সবচেয়ে বেশি জোরদার হয়েছে জরুরি অবস্থার পর শেখ হাসিনার একনাগাড়ে ১৬ বছরের শাসনামলেই।

এইসব অপপ্রচার অসুস্থতার লক্ষণ

কোনো বিষয়ে ভিন্ন মত, ভিন্ন ব্যাখ্যা, ভিন্ন যুক্তি থাকতে পারে। কিন্তু তথ্য ও ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার, সত্যকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা, অন্যায়কে ন্যায়, ন্যায়কে অন্যায় বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ইত্যাদি হচ্ছে ভয়ংকর নৈতিক অধঃপতন। এটা অন্যকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তেমনি যারা এই কাজ করছেন তারাও নৈতিকভাবে এবং মানুষ হিসেবে চরম কলুষিত ও বিপথগামী হচ্ছেন। তারা স্বকীয় সমাজকেও কলুষিত করছেন এবং নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই দেশের জনসমাজের মধ্যে এগুলি গভীর অসুস্থতার লক্ষণ।

এইসব অপপ্রচার, মিথ্যাচার, বিকৃত বয়ান দেশের জনমানসকে শুধু কলুষিত করছে না। এইসব অপপ্রচারের মাধ্যমে শুধু জুম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, হিংসা, মিথ্যাচার ছড়ানো হচ্ছে না। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন জাতির মানুষ জুম্মদের মুছে ফেলার বয়ান তৈরি করছে এবং জাতিগত সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার যথাযথ রাজনৈতিক সমাধানেও চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করছে।

সরকার ও প্রশাসন পদক্ষেপ নিতে পারে

বলাবাহুল্য, যারা জুম্ম বিরোধী বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে বা তাদের বিদ্বেষমূলক ও হিংসাত্মক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সরকার ও প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি এ পর্যন্ত। প্রকাশ্যে জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরকরণের কাজ চলছে এবং সেগুলো সগৌরবে প্রচারও করা হচ্ছে। এটা প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র, সরকার ও প্রশাসনের সবাই না হলেও তাদেরই একটি গোষ্ঠী এসব কর্মকান্ডে আশ্রয়-প্রশ্রয় যুগিয়ে থাকে।

সবচেয়ে ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক হচ্ছে, সরকার হয় উদাসীনতা প্রদর্শন করছে নয়তো প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্বশীল প্রশাসন– পুলিশ, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দৃশ্যত মদদ দিচ্ছে এবং উৎসাহিত করছে। অপরদিকে দেশের সুশীল সমাজ হয় এই অপপ্রচারে আক্রান্ত হয়েছে বা আত্মসমর্পণ করেছে, অথবা এই অপপ্রচারের শক্তির কাছে জিম্মি হয়েছে। তারা অনেকেই দেখেও না দেখার ভান করছে। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, সরকার বা প্রশাসন বা দেশবাসী এসব দেখছেন না।

যেকোনো ঘটনা বা সমস্যাকে জানতে হলে এবং সঠিক সমাধান করতে হলে সে বিষয়ে সকল প্রকার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, তার উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার যথাযথ সমাধানের ক্ষেত্রেও এটা অপরিহার্য। কিন্তু কিছু সাম্প্রদায়িক ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ, তাদের আন্দোলন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যাচার এবং তথ্য বিকৃতি করে চলেছে। এইসব বিষয়ে ভুল, বানোয়াট এবং উস্কানিমূলক বয়ান সৃষ্টি করে চলেছে। এইসব কর্মকান্ড নিঃসন্দেহে জনগণকে, দেশবাসীকে, নতুন প্রজন্মকে বিপথে পরিচালিত করছে এবং ঘোরতর হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সূচনা ও সমাধানের উপায়

॥ সোহেল তনচংগ্যা ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি ঐতিহাসিক জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। যার সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু জুম্মদের স্বশাসন, ভূমি, পরিচয়, রাজনীতি, অর্থনীতি ও উন্নয়ন অসামঞ্জস্যের মধ্যে প্রোথিত। রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি-নিয়ে গঠিত এই পার্বত্য অঞ্চল বহু জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খুমী, খিয়াং, চাক, পাংখোয়া, বম, লুসাই, সাঁওতাল, অহমিয়া, গুর্খা এই ১৪ জাতিগোষ্ঠী ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখানে বসবাস করে আসছে। কিন্তু ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা কারণে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে এক অস্থিরতা ও সমস্যা বিরাজমান। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কেবল একটি রাজনৈতিক ইস্যু নয়– এটি জাতীয় ঐক্য, ন্যায়বিচার ও উন্নয়নের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার শিকড় নিহিত হয়েছে ঔপনিবেশিক আমল থেকে। যদিও ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল সমতলের তুলনায় ভিন্নধর্মী ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলকে 'Excluded Area' বা বিশেষ শাসিত এলাকা ঘোষণা করে, যাতে সমতলের জনগণের অবাধ প্রবেশ ও বসতি স্থাপন সীমিত ছিল। যেখানে স্থানীয় প্রথা, সামাজিক কাঠামো এবং ঐতিহ্যগত নেতৃত্বকে বহুলাংশে বজায় রাখা হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তফসিলীভুক্ত পৃথক জেলা হিসেবে ঘোষণা করে। পৃথক জেলা ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করে। জেলার শাসনভার একজন সুপারিনটেনডেন্টের (পরে ডেপুটি কমিশনার) হাতে ন্যস্ত করা হয়। তবে সমতলের মতো এখানে সাধারণ আইন প্রয়োগ না করে স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ব্রিটিশরা প্রশাসনিক সুবিধার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে– চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেল। প্রতিটি সার্কেলের নেতৃত্বে ছিলেন একজন করে চীফ বা রাজা, যাদের ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করত। তারা কর আদায়, স্থানীয় বিচারকার্য পরিচালনা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। সার্কেলের অধীনে মৌজা ও মৌজার প্রধান হেডম্যান ব্যবস্থাও চালু ছিল, যা তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসন পরিচালনায় সহায়ক ছিল। এই পদ্ধতিতে ব্রিটিশরা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখলেও স্থানীয় শাসকদের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করত-যা ছিল পৃথক শাসনব্যবস্থার একটি উদাহরণ।

১৯০০ সালে প্রণীত 'চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন, ১৯০০' এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র করে তোলে। এই বিধির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি বিশেষ শাসনাধীন অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সমতলের মানুষদের অবাধে বসবাস ও ভূমি অধিগ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, যাতে জুম্ম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পায়। এই আইনে জুম্মদের ভূমি-ব্যবস্থা, প্রথাগত আইন এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনার সুযোগ রাখা হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে প্রত্যক্ষ শাসনের পরিবর্তে স্থানীয় নেতৃত্বকে ব্যবহার করে পৃথক শাসন কার্যকর করা হয়। এই ব্যবস্থা একদিকে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করলেও অন্যদিকে জুম্ম জনগোষ্ঠীর প্রথাগত কাঠামো সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাক-ভারত ভাগ হলেও আদতে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা ছিল অমুসলিম ৯৮.৫% এবং মুসলিম ১.৫%। কিন্তু এই অঞ্চলটিতে সংখ্যাগরিষ্ট অমুসলিম থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে তখন এখানকার জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান শাসনামল থেকে পাহাড়ে ধীরে ধীরে স্বায়ত্তশাসন কমতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'Excluded Area' মর্যাদা বাতিল করা হয়। এতে অঞ্চলটিতে সরাসরি তখনকার সরকারের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। যার সরাসরি আঘাত হানে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর সাথে কোনোরূপ মতামত না নিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে জুম্মদের ধ্বংস করার জন্য ছিল এক ষড়যন্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাহাড়ে অনেক অঞ্চলে এখনো জুম্মদের ঘরে বিদ্যুৎতের আলো পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

এই প্রকল্পের কারণে জুম্মদের সামাজিক ও মানবিক প্রভাব ছিল গভীর ও বহুমাত্রিক। বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় পাহাড়ে ৪০

শতাংশ আবাদযোগ্য জমি পানির নিচে তলিয়ে যায়। আনুমানিক ১ লক্ষাধিক মানুষ নিজেদের বসতভিটা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়, যাদের অধিকাংশই ছিল জুম্ম আদিবাসী জনগোষ্ঠী-বিশেষত চাকমা ও মারমা সম্প্রদায়। বহু মানুষ বসতভিটা ও চাষযোগ্য জমি হারিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও কার্যকর পুনর্বাসনের অভাবে অনেক পরিবার ভূমিহীন হয়ে যায় এবং কেউ কেউ ভারতের অরুণাচল অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

এই সময় জুম্মদের ঐতিহ্যগত সামাজিক কাঠামো ও সংস্কৃতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুচ্যুতি ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার আন্দোলনের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই কাপ্তাই বাঁধ শুধু একটি উন্নয়ন প্রকল্পই নয়; এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানীয় জনগণের স্বার্থ ও মানবাধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত হলে যে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, কাপ্তাই বাঁধ তার একটি বাস্তব উদাহরণ।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাস স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও এই সময় বিজয়ী 'মুক্তিবাহিনী' প্রতিশোধ ও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে, যার ফলে তখন সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নিরীহ জুম্ম জনগণের উপর মুক্তিবাহিনীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ এবং জুম্মদের গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের পরপরই, মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের তাণ্ডব চালায়। ফলে ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর পানছড়িতে ১৬ জন, দীঘিনালায় ১৮ জন এবং ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুকিছড়ায় ২২ জন জুম্মকে নির্বিচারে হত্যা করে। তাছাড়া মাটিরাঙ্গা, রামগড় এবং মানিকছড়িতে জুম্মদের বিপুল পরিমাণ ধান্য জমি ফেনী জেলার বাঙালি মুসলিমদের দ্বারা জোরপূর্বক দখল করা হয়।

জুম্ম জনগণ আশা করেছিল, যে বাঙালি জাতি জাতিগত অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন ও দমনের বিরুদ্ধে জীবন দিয়েছে অন্তত তারা পাহাড়ের মানুষদের দীর্ঘদিনের নিপীড়ন ও বৈষম্য থেকে মুক্তি প্রদান করবে। তাই জুম্ম জনগণ তৎকালীন সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকারকে সম্মান করেনি এবং সংবিধানে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব এবং সুরক্ষা সম্পর্কে একটি শব্দও লেখেনি। বরং ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিকীকরণের আওতায় পড়ে। শেখ মুজিবের আমলে দীঘিনালা, রুমা এবং আলিকদমে তিনটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুক্তিবাহিনী কর্তৃক অব্যাহত সন্ত্রাসের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিস্তৃত অসন্তোষ থেকে শুরু করে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

এই সময় নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় জুম্মদের পরিচয়ের প্রশ্নটি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার কারণে পাহাড়ে জুম্ম জনগণ একটি সাধারণ রাজনৈতিক মঞ্চে একত্রিত হতে বাধ্য হয়। যার প্রতিফলন হিসেবে, ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাহাড়ের একমাত্র জুম্মদের রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) সৃষ্টি হয়।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশের প্রথম নির্বাচনে বিপুল ভোটে তখন জয়লাভ করেন জুম্মদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তরাঞ্চল থেকে। এই পটভূমিকায়, তৎকালীন সংসদ সদস্য এম এন লারমা এবং বাংলাদেশ সরকারের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা রাজা মং প্রু চেইন চৌধুরীর নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের একটি প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা ও নৃশংসতার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে চার দফা সনদ সম্বলিত একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেয়।

পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল এম এন লারমা বাংলাদেশ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে আরেকটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। তাদের লক্ষ্য ছিল চার দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করা, যার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য নিজস্ব আইনসভাসহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সংবিধানে এই দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা। এই সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এম এন লারমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করতে হুমকি প্রদান করেন। তিনি এই দাবিগুলো স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'লারমা তুমি কি মনে কর। তোমরা আছ ৫/৬ লাখ, বাড়াবাড়ি করো না। চুপচাপ করে থাক। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের অস্ত্র দিয়ে মারবো না, (হাতের তুড়ি মেরে মেরে তিনি বলতে লাগলেন) প্রয়োজনে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ...১০ লাখ বাঙালি অনুপ্রবেশ করে তোমাদেরকে উৎখাত করবো, ধ্বংস করবো।'

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক মর্যাদার অস্তিত্ব বাতিল করে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের আড়ালে এক কলমের খোঁচাতেই জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব

লুপ্ত করে দিতে জোরপূর্বক সংবিধানে জুম্মদের 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর মতো বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীরাও তখন একই কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে সীমান্ত অঞ্চল ও কৌশলগত সামরিক অঞ্চল হিসেবে মূল্যায়ন করতে থাকে। ফলে জিয়াউর রহমানের সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার ও ভোট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প হাতে নেয়া নয়। তখন পাহাড়ে জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বদল ও ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ১৯৭৯-৮৩ সময়কালে প্রায় ৪-৫ লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালি পাহাড়ে বসতিপ্রদান করা হয়। সেটেলারদের পাহাড়ে বসতিপ্রদানের পরপরই ৭০ এবং ৮০ দশকে মূলত পাহাড়ে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। আর সেটেলারদের নিরাপত্তার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তীতে দীর্ঘ দুই যুগ সংঘাতের অবসান সমাপ্ত করে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর জুম্ম জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আজ চুক্তির ২৮ বছরের অধিক পূর্ণ হলেও এখনো চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। যার কারণে পাহাড়ে প্রতিনিয়ত ভূমি বেদখল, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, মিথ্যা মামলা, জুম্মদের ঘরবাড়িতে তল্লাশি, হয়রানির মতো জঘন্য কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। রাষ্ট্র চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়ন না করে জুম্মদের বিরুদ্ধে চুক্তি বিরোধী শক্তিকে নানাভাবে লেলিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। যার ফলাফল হিসেবে চুক্তির পরপরই ১৯৯৮ সালে ইউপিডিএফ (প্রসিত) গঠন, ২০০৭ সালে জেএসএস সংস্কারপন্থী গঠন, মগপার্টি, কেএনএফের মতো চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করে পাহাড়ের পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার জন্য নানা অপকর্ম পরিচালনা করা হচ্ছে। যার কারণে জুম্মরা আজও দুর্বল ও দিন দিন প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

বর্তমানে দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দুই-তৃতীয়াংশ সংসদীয় আসন পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন দলটির নেতা তারেক রহমান। এই সময় দপ্তর বণ্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পান ২৯৯ পার্বত্য রাঙামাটি আসন থেকে বিএনপির নির্বাচিত সংসদ সদস্য দীপেন দেওয়ান। তার সঙ্গে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে। যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সরাসরি লঙ্ঘন।

চুক্তির ৪টি খন্ডের ৭২টি ধারার মধ্যে 'ঘ' খন্ডের ১৯ নং ধারা অনুসারে 'উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে' মর্মে বিধান করা হয়। কিন্তু উক্ত চুক্তিতে কোনরূপ বাঙালি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার বিধান উল্লেখ করা হয়নি।

বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পুনর্মূল্যায়নের কথা বলেছে। কিন্তু তারা আদতে কোন উপায়ে সেটি করছে? তারা কি পাহাড়ের চুক্তি পক্ষীয় তথা সমগ্র জুম্ম জনগণের মতানুসারে করতে যাচ্ছে? নাকি বিগত সরকারের ন্যায় বিএনপি সরকারও একইভাবে চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী পথে হাঁটতে যাচ্ছে? এই প্রশ্নই ভবিষ্যতের পাহাড়ে রাজনীতির দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে।

বলা বাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফল। যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে জুম্মদের জাতিগত পরিচয়, ভূমি অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন। কেবল সামরিক বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয় বরং এখানে প্রয়োজন রাষ্ট্রের আন্তরিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা। তবেই পাহাড়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব, অন্যথা নয়।

সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের তরুণ প্রজন্ম বর্তমানে প্রযুক্তি-নির্ভর, তথ্যসচেতন এবং বৈশ্বিক মানবাধিকার ভাষার সঙ্গে পরিচিত। তারা শুধু রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের সদস্য হিসেবে নয় বরং স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছে বারংবার প্রশ্ন তুলছে। এই তরুণ প্রজন্মের কাছে রাজনীতি কেবল ক্ষমতার প্রশ্ন নয়, এটি রাজনৈতিক অধিকার, পরিচয়, মর্যাদা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রশ্ন।

আগের প্রজন্ম পার্বত্য চুক্তিকে সংগ্রামের অর্জন হিসেবে দেখলেও পাহাড়ের বর্তমান প্রজন্ম দেখার চেষ্টা করছে তার বাস্তব ফলাফল। যার কারণে আবেগের বদলে বর্তমানের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তারা বারংবার পাহাড়ের সমস্যাগুলোকে নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর কাছে প্রশ্নের তীর ছুড়ে দিচ্ছে– কেন ভূমি বিরোধের সমাধান হয়নি? কেন চুক্তির অধিকাংশ ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি? কেন পাহাড়ে গণতান্ত্রিক তথা আইনের শাসন এখনো অনুপস্থিত?

যার ফলস্বরূপ পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের বিকল্প পথের দিকে ধাবিত হচ্ছে এই তরুণ প্রজন্ম। যার শেষ হয়তো খুবই ভয়াবহ হতে বাধ্য। সুতরাং বর্তমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ৭ দলীয় জোট সরকারকে অবশ্যই পাহাড়ের সমস্যাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।

বর্তমানে পাহাড়ের রাজনীতি এখন একটি প্রজন্মগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তরুণ এই বর্তমান প্রজন্ম অতীতকে অস্বীকার করছে না বরং তা পুনর্মূল্যায়ন করছে। ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা অনেকাংশেই নির্ভর করছে এই তরুণ প্রজন্মের ভাবনা ও অংশগ্রহণের ওপর।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট

সারাদেশের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসনেও ১২ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। তিনটি আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর তিন প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছে। ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনে এডভোকেট দীপেন দেওয়ান, ৩০০ পার্বত্য বান্দরবান আসনে সাচিং প্রু জেরী এবং ২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বিজয় অর্জন করেছেন।

এবারে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসন থেকে রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের প্রার্থী অ্যাডভোকেট দীপেন দেওয়ান পেয়েছেন সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট মোট ২,০১,৮৪৪, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা পেয়েছেন ৩১১৪২ ভোট। অপরদিকে বান্দরবান সংসদীয় আসন থেকে সাচিংপ্রু জেরী পেয়েছেন ১,৪১,৪৫৫ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপি প্রার্থী আবু সাইদ মো. সুজাউদ্দিন পেয়েছেন ২৬,১৬২ ভোট এবং খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসন থেকে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া পেয়েছেন ১,৫১,০৪০ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ধর্মজ্যোতি চাকমা পেয়েছেন ৬৮,৩১৫ ভোট।

উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ জাতীয় সংসদের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৯ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএনপি, জামায়াতসহ ৫০টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এ নির্বাচনে ২৯৯ আসনে ২০২৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তার মধ্যে রাজনৈতিক দলের ১,৭৫৫ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ২৭৩ জন প্রার্থী ছিলেন। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৯৯ আসনের মধ্যে বিএনপি জোট পেয়েছে ২১২টি আসন, জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী জোট ৭৭টি আসন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি এবং স্বতন্ত্র ও অন্যান্য দল ৭টি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে। এছাড়া, এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ২টি আসন- চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়। বলাবাহুল্য, বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

এ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপক হাঙ্গামা ও জাল ভোটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। হাঙ্গামা ও ভোটকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে সারাদেশে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জাল ভোটের চেষ্টা করায় ৩৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোনো কোনো কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আবার কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট না দিলে ভোটারদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে।

২৯৮ পার্বত্য খাগড়াছড়ি সংসদীয় আসনে বিএনপি প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সমর্থকরা রামগড়, মানিকছড়ি, গুইমারা, মাটিরাঙ্গা ও দীঘিনালার কয়েকটি কেন্দ্রে কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। দীঘিনালার রসিক নাগর পাড়া কেন্দ্রে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সমর্থকরা ভোট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের চেষ্টা চালায়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ছিনতাইকৃত ভোট বাক্স ও ব্যালট পেপার উদ্ধার করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলায় ফুটবল মার্কায় স্বতন্ত্র প্রার্থী সমীরণ দেওয়ানের পক্ষে ক্যাম্পেইন করায় পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) ৫ জনকে অপহরণ করে। তার মধ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি রাত ৯ ঘটিকার সময় পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের মাছ্যছড়া পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে হিমেল চাকমা যুবক্কে নামে এক গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে এবং লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নের শীলছড়ি এলাকা থেকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক ১১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬:২০ ঘটিকার সময় চাইথোয়াই উ মারমা, উ থোয়াই অং মারমা এবং আরেশে মারমা নামে তিন গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়। অপরদিকে একই ইউনিয়নের কুতুকছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে নির্বাচনের দিন (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক সমীরণ দেওয়ানের সমর্থক দন্তি পাড়ার বাসিন্দা চাইহ্লামং মারমা নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঘোড়া মার্কার প্রার্থী ধর্মজ্যোতি চাকমার পক্ষে ভোট দিতে গ্রামবাসীদের বাধ্য করতে এবং তাদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ এই অপহরণের মতো জঘন্য কাজটি সংঘটিত করে। শুধু তাই নয়, ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ ঘোড়া মার্কায় ধর্মজ্যোতি চাকমাকে যিনি ভোট দিবেন না,

তাকে কয়েক কেজি হাঙ্গর মাছ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অতিথিদের খাওয়ানোর জন্য) নিয়ে উপস্থিত হতে হুমকি দেয়।

পার্বত্য এলাকায় ইতোমধ্যে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া সন্ত্রাসের গডফাদার, উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত হলেও তার বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হওয়ার পেছনের মূল কারণ- জুম্মদের একটা সুবিধাবাদী অংশ তার পক্ষে ভোট দিয়েছে বলে অভিজ্ঞমহলের অভিমত। বিশেষ করে মারমা ভোটার এবং কিছু সংখ্যক ত্রিপুরা ও চাকমা ভোটাররা সুবিধা পাওয়ার আশায় ওয়াদুদকে ভোট দিয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

অনেকের অভিযোগ রয়েছে যে, আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া জুম্ম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের বিভক্ত করা এবং সম্ভাব্য শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী সমীরণ দেওয়ানকে ঠেকাতে অনেক আগেই গোপন সমঝোতার মাধ্যমে বড় অংকের টাকা দিয়ে সুকৌশলে ইউপিডিএফ ধর্মজ্যোতি চাকমাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মাঠে নামিয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে ধর্মজ্যোতি চাকমা নমিনেশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। কিন্তু ইউপিডিএফ কৌশলে ধর্মজ্যোতি চাকমাকে তাদের হেফাজতে আটকে রেখে নমিনেশন প্রত্যাহারের দিনক্ষণ পার করে দেয়। এছাড়া কোনো কোনো জায়গায় ইউপিডিএফের দীর্ঘদিনের হয়রানি ও চোখ রাঙানিতে অতিষ্ট হয়ে কিছু সাধারণ জুম্মও অনন্যোপায় হয়ে ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে ভোট দিয়েছে বলে জানা যায়।

অন্যদিকে গণভোটের প্রাপ্ত ফলাফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সংসদীয় আসনে 'না' ভোট জয়ী হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ফলাফল শিট অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি আসনে– বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি আসনে 'না' ভোট 'হ্যাঁ' ভোটের চেয়ে বেশি পেয়েছে। এটা অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক সংস্কার প্রক্রিয়া ও জুলাই সনদ প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এবং হ্যাঁ ও না ভোট নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় পার্বত্য এলাকার জনসাধারণের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব এবং মতামতকে উপেক্ষা করার একটি ফল বলে অনেক অভিজ্ঞমহলের অভিমত।

রাঙামাটিতে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৭১,৬৯৯টি এবং 'না' ভোট পেয়েছে ১,৭৯,৮০৫টি, যা ব্যবধানের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। এ আসনের মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৯ হাজার ২৬৭ জন।

খাগড়াছগিতে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১,৪৪,৩৫৫টি, আর 'না' ভোট পেয়েছে ১,৫৫,৯৪২টি। এ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৩ জন।

অন্যদিকে বান্দরবানে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৭১,৪১৭টি, আর 'না' ভোট পড়েছে ৯০,১৫৬টি। এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,১৫,৪২২ জন।

এবারের নির্বাচনে গণভোট পড়েছে ৬০ দশমিক ২৬ শতাংশ। 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৪ কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯টি। আর 'না' ভোট পড়েছে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭ টি।

গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ায় এখন জুলাই জাতীয় সনদে একমত হওয়া বিষয়ের আওতায় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই কাজ করবেন সংসদ নির্বাচনে জয়ী এমপিরা। সংসদের অধিবেশন শুরুর ১৮০ দিন পর্যন্ত তারা 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ' এর সদস্য হিসেবে পরিচিত হবেন। অর্থাৎ, জুলাই সনদে একমত হওয়া বিষয়গুলোর আলোকে তারা সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনবেন।

> দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক, তা বলে শেষ করা যায় না। দুর্নীতি যদি আমরা দূর করতে না পারি, তাহলে সরকার যত রকমের আইনই করুক না কেন, যত কড়া নির্দেশনামাই দিক না কেন, কোন সুরাহা হবে না। আজকে এই দুর্নীতি সবখানে। ..এই দুর্নীতিকে আঁকড়ে ধরে যারা কালো টাকা রোজগার করে, আইনের ছত্রছায়ায় তাদেরকে রক্ষা করা হয়। *– মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। ফলে চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় ২০২৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। ২০২৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, রোহিঙ্গ্যা সশস্ত্র জঙ্গী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ২৬৮টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এসব ঘটনায় ৬০৬ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং ১৯৩টি জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে টহল অভিযান চালানো হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে ৮ জন জুম্মকে বিচার-বহির্ভূত হত্যা, ১১৭ জন জুম্মকে গ্রেফতার, ২টি বৌদ্ধ মন্দিরসহ ৪৩টি বাড়িতে তল্লাশি, ৩২ জন জুম্ম নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা এবং ৩০ জন ম্রো শিশুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর করা হয়েছে। ২০২৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও দেশের আদিবাসী জনগণের উপর ব্যাপক আকারে দুইটি নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া বহিরাগত কোম্পানি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সেটেলার কর্তৃক কমপক্ষে ৩০০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক সংবিধানসহ সংস্কার কার্যক্রমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আশা করেছিল যে, আদিবাসীসহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান বৈষম্য ও নিপীড়নসমূহ চিহ্নিত করে তা অবসানের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপের সুপারিশ করার জন্য আলাদাভাবে একটি সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। কিন্তু ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো আলাদা কমিশন গঠন করা হয়নি। পরবর্তীতে যে সকল কমিশন গঠন করা হয়েছে সেখানেও আদিবাসীসহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এমনকি সংবিধান সংস্কার কমিশনেও কোনো সংখ্যালঘু প্রতিনিধি নেই। সংখ্যালঘুদের ওপর চলমান বৈষম্যসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্যে কমিশনগুলো কোন সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদলের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। অপরদিকে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গৃহীত জুলাই সনদেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিষয়ে কোনো কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যা বর্তমান সরকারের আমলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি গভীর বৈষম্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন:

২০২৫ সালেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার অগ্রগতি লাভ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার ১২ জানুয়ারি ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বাহক হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো: তৌহিদ হোসেনকে এবং ২৮ আগস্ট ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ'কে নিয়োগ দিয়েছে। এছাড়া ২০ জানুয়ারি ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মেজর জেনারেল (অব:) অনুপ কুমার চাকমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯ জুলাই ২০২৫ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও সভার সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি নেই।

২০২৫ সালে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বাঙালি মুসলিম সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে উস্কে দেয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলন, স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি, ডায়লগ ফর পিস অব চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (ডিপিসি), সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা পরিষদ, বৈষম্যবিরোধী পার্বত্য চট্টগ্রাম ঐক্য পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আইনজীবী ফোরাম, সিএইচটি সম্প্রীতি মঞ্চ ইত্যাদি নামে বাঙালি মুসলিম সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব ভূঁইফোড় সংগঠনগুলোকে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবিতে এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর ও উস্কানিমূলক তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপন সহ

সেমিনার-সমাবেশ-মানববন্ধন-আলোচনা সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

যেমন ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর গত ১৯ অক্টোবর ২০২৫ কমিশনের সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু সেনামদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) এর হরতালের হুমকিতে কমিশনের উক্ত সভাটি স্থগিত করা হয়। অনুরূপভাবে গত ২২ অক্টোবর ২০২৫ ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ১২তম সভা আহ্বান করা হলে সেটেলারদের হুমকিতে উক্ত সভাও স্থগিত করা হয়। শুধু তাই নয়, সেটেলারদের বাধা ও হরতালের কারণে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগও স্থগিত হয়েছে। এভাবেই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে বাঙালি সেটেলার ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে লেলিয়ে দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বাঙালি মুসলিম সেটেলার কর্তৃক এসব সরকারি কাজে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফ থেকে বাধাপ্রদানকারী সেটেলারদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরঞ্চ নির্লিপ্ত ভূমিকা গ্রহণ করে প্রশাসনের তরফ থেকে সেটেলারদেরকে প্রকারান্তরে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাঁচটি রাজনৈতিক সরকার এবং দুইটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো সরকারই রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারও চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে এগিয়ে আসেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে।

মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে স্বশাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা হস্তান্তর এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন পূর্বক এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে জুম্মদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ করা, 'অপারেশন উত্তরণ' নামক সেনাশাসনসহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য পুলিশ বাহিনী গঠন করা, জুম্মদের জায়গা-জমি থেকে সেটেলার বাঙালিদের সরিয়ে নিয়ে সমতল জেলায় পুনর্বাসন দেওয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে।

(খ) মানবাধিকার পরিস্থিতিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান না করে ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। জনসংহতি সমিতিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাসী', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'অবৈধ অস্ত্রধারী' হিসেবে তকমা দিয়ে ক্রিমিনালাইজ করা, মিথ্যা মামলা দায়ের করা, গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করা, অমানুষিক মারধর ও হয়রানি, বিচার-বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদি দমন-পীড়ন অব্যাহতভাবে চলছে।

১। বিচার-বহির্ভূত হত্যা

২০২৫ সালে সংঘটিত ২৬৮টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ১৬৩টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এসব ঘটনায় ২২৪ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচার-বহির্ভূত হত্যার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। একজন মারমা ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনজন জুম্ম নিহতসহ ২০২৫ সালে ৮ জন জুম্ম হত্যার শিকার হয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় যে, এসব হত্যা ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদেরকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। কোনো মামলাও দায়ের করা হয়নি।

মারমা ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ির গুইমারায় সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গুলিতে আখ্র মারমা (২২), থোয়াইচিং মারমা (২০) ও আথুইপ্রু মারমা (২১) নামে তিনজন নিহত হয়। এছাড়া ১১ আগস্ট ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি

উপজেলার কজইছড়ি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ক্যাম্পের চেকপোস্টের বিজিবি সদস্যদের পিটুনিতে মারাত্মক জখম হয়ে শুভ চাকমা (১৯) নামে এক জুম্ম তরুণ নিহত হন। কজইছড়ি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা এ ঘটনাটিকে স্রেফ একটি দুর্ঘটনা বলে ব্যাখ্যা দিয়ে দায়মুক্তি পেয়েছেন। গত ১৫ আগস্ট ২০২৫ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের শান্তিনগর এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে কংচাইঞো মারমা (৩১) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। এছাড়া ১৫ মে ২০২৫ লাল ত্লেং কিম বম (২৯), ৩১ মে ২০২৫ লাল সাংময় বম (৫৫) এবং ১৭ জুলাই ২০২৫ ভান লাল রুয়াল বম (৩৫) নামে তিনজন বমকে কারা হেফাজতে চিকিৎসা না দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

অপরদিকে ২০২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনজন জুম্মকে হত্যা এবং সেটেলার কর্তৃক দীঘিনালায় একজনকে হত্যা ঘটনায় জড়িত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বিগত একবছরেও গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং এমনকি কোনো মামলাও দায়ের করা হয়নি। উক্ত ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও বিগত এক বছরে উক্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। অপরদিকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাঙ্গামাটিতে একজন জুম্মকে হত্যা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় পৃথক দু'টি মামলা হলেও মূল হোতাদেরকে বিগত এক বছরেও বিচারের আওতায় আনা হয়নি। সন্দেহভাজন ৫ জনকে গ্রেফতার করা হলেও ইতিমধ্যে একজন ব্যতীত বাকীরা সবাই জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

২। নির্বিচার গ্রেফতার

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন দমন-পীড়নের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে নিরীহ জুম্মদের গ্রেফতার করে চলেছে। অস্ত্র গুঁজে দিয়ে, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজির অজুহাত তুলে নিরীহ জুম্মদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। ২০২৫ সালে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক ১১৭ জন জুম্মকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৭ জনকে সাময়িক আটকে রেখে নির্যাতনের পরে ছেড়ে দেয়া হয়। অবশিষ্ট ৭০ জনকে জেলে প্রেরণ করা হয়।

গত ৩ আগস্ট ২০২৫ বান্দরবান সদর জোনের নিয়ন্ত্রণাধীন নীলগ্রী ক্যাম্পের সেনাবাহিনী কর্তৃক থানচি উপজেলার বলিপাড়া ইউনিয়নের নাইক্কোং পাড়া থেকে তিনজন জুম্মকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারের সময় সেনাবাহিনী একটি গাদা বন্দুক ও ৫ রাউন্ড গুলি গুঁজে দিয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিক গত ২৬ আগস্ট ২০২৫ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এক সেনা অভিযানে রাঙ্গামাটির জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়ন ও মৈদুং ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামের ১৭ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আটকের শিকার হয়েছেন। সেনা সদস্যারা আটককৃত গ্রামবাসীদের বেদম মারধর ও নির্যাতন চালায়।

গ্রেফতারের ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ দায়েরকৃত একটি মামলায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের কোয়ান্টাম এলাকা থেকে রিংরং ম্রোকে গ্রেফতার করে একদল সাদা পোশাকের পুলিশ। একটা ঝিরির পানিতে কীটনাশক বিষ ঢেলে দেওয়ার অভিযোগে পাড়াবাসীরা মামলা করেন লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মামলার অভিযুক্ত কারো বিরুদ্ধেই পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো পুলিশ ভূমিদস্যু লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজের দায়েরকৃত মামলায় অভিযুক্ত ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের গ্রেফতার করে চলেছে।

সশস্ত্র গোষ্ঠী কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর সন্ত্রাসী তৎপরতার দায় সাধারণ বম জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিয়ে ২০২৪ সালে বম জনগোষ্ঠীর ১৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ২০২৫ সালে ৮৩ জন মুক্তি পেলেও শিশু সহ এখনো ৫৯ জন বিনা বিচারে জেলে অন্তরীণ রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে চিকিৎসার অভাবে ২০২৫ সালে ৩ জন বম কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছে। সেনাবাহিনী ও কেএনএফের অত্যাচারে স্ব স্ব ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতের মিজোরামে আশ্রয় নেয়া প্রায় ৩,০০০ বমকে এখনো দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি।

৩। সামরিক অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাশি, মারধর ও হয়রানি

সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে প্রতিনিয়ত সামরিক অভিযান পরিচালনা করে থাকে। এসব অভিযানের সময় সেনাবাহিনী জুম্মদের ঘরবাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ, মারধর, হয়রানি, হুমকি, আহতকরণ, আটক করা ইত্যাদি মানবতাবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। ২০২৫ সালে সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যরা কমপক্ষে ১৯৩টি জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। এসব অভিযানে কমপক্ষে ৬৫ জন জুম্মকে মারধর, হুমকি প্রদান, আহত করা হয়েছে। ২টি বৌদ্ধ মন্দিরসহ ৪৩টি বাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। এছাড়া আটক করা হয়েছে কমপক্ষে ১১৭ জনকে।

যেমন ২০ মে ২০২৫ থেকে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক আমতলী সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মোবারক এর নেতৃত্বে এক সেনাদল সুয়ালক, টংকাবতী ও চিম্বুক এলাকায় সেনা অভিযানের সময় টংকাবতীর চিনিপাড়া গ্রামে ৬ জুম্ম গ্রামবাসীকে ব্রীকফিল সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক মারধর করে। ৬ আগষ্ট ২০২৫ সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান জেলার

রুমা ও থানচি উপজেলায় বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে ব্যাপক সেনা অভিযান চালায় এবং এতে অন্তত একজনকে আটক, দুই ব্যক্তিকে মারধর ও বিভিন্ন বাড়িতে হয়রানিমূলকভাবে তল্লাশি করা হয়েছে। ১১ আগস্ট হতে ১৩ আগস্ট ২০২৫ তিন দিন ধরে ৩৮ বীর কাপ্তাই সেনা জোনের জনৈক কমান্ডারের নেতৃত্বে সেনা জোন ও স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরা রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার চিৎমরমের বটতলী পাড়া, বামনী পাড়া, চিৎমরম বড় পাড়া এবং ঐতিহ্যবাহী চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালায়।

সেনাবাহিনী কেএনএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দায় সমগ্র বম জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিয়ে বান্দরবানের বম জনগোষ্ঠীর সবার চলাফেরা ও কেনাকাটার ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হলে সেনাবাহিনী থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হয়। কৃষককে তাঁর উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে লিখিত আবেদন করতে হয়। বান্দরবান থেকে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের জন্যও নিতে হয় অনুমোদন।

৪। সাম্প্রদায়িক হামলা

২০২৫ সালে জুম্ম জনগণ তথা আদিবাসী জনগণের ওপর ব্যাপক আকারে দুইটি নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকায় প্রকাশ্যে 'স্টুডেন্টস ফর সভারেন্টি'র ব্যানারে মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও মৌলবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক 'সংক্ষুব্ধ আদিবাসী ছাত্র-জনতা'র উপর নৃশংস ও বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়। এ হামলায় কমপক্ষে ১৮ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক গুরুতরভাবে আহত হন। উক্ত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোতে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হলেও পরে তিনজনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। উক্ত ঘটনার যথাযথ বিচার এখনো নিশ্চিত করা হয়নি।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় এক জুম্ম কিশোরীকে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণের ঘটনায় 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র উদ্যোগে আহুত হরতাল চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনীর ইন্ধনে ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বাঙালি মুসলিম সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের উপর নৃশংস সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়। এতে ২৭ সেপ্টেম্বর 'জুম্ম ছাত্র-জনতা'র সাথে সেটেলার বাঙালিদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ফলে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে অন্তত ৩ (তিন) জুম্ম গুরুতর আহত এবং ২৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা রামসু বাজার ও এর আশেপাশের জুম্ম বসতিতে সেনাবাহিনী, বাঙালি সেটেলার ও বহিরাগত দুষ্কৃতিকারীদের কর্তৃক সম্মিলিতভাবে উপর্যুপরি হামলায় ৩ জন জুম্ম নিহত এবং অন্তত ২০ জনের অধিক আহত হয়েছে। এছাড়া রামসু বাজারে জুম্মদের ৫৪টি দোকান, ২৬টি ঘরবাড়ি ও ১৬টি মোটরসাইকেল অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়। এতে জুম্মদের প্রায় ২৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে তিনজন জুম্ম নিহত হলেও উল্টো পুলিশ বাদী হয়ে সহিংসতা ও ভাঙচুরের অভিযোগে জুম্মদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে। তম্মধ্যে খাগড়াছড়ি থানায় একটি ও গুইমারা থানায় দু'টি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাগুলোতে হত্যা, ভাঙচুর, পুলিশের ওপর হামলা ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দাঙ্গা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে। খাগড়াছড়ি সদর থানায় দায়েরকৃত মামলায় ৬০০ থেকে ৭০০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে। অপরদিকে গুইমারা থানায় দায়ের হওয়া দুটি মামলায় তিনজনকে হত্যা ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে অজ্ঞাত ২৫০-৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পক্ষ থেকে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি।

৫। ভূমি বেদখল, অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তর

বান্দরবান জেলার লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান সদর সহ বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগত বিভিন্ন কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির উদ্যোগে রাবার বাগান, হর্টিকালচার, পর্যটন কেন্দ্র ব্যবসার নামে চলছে জুম্মদের শ্মশান, বৌদ্ধ বিহার, জুম ভূমি সহ বসতভূমি বেদখল, উচ্ছেদ, মিথ্যা মামলা দায়ের, হামলা ও অগ্নিসংযোগ।

২০২৫ সালে ২৬৮টি ঘটনার মধ্যে মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যু কর্তৃক ৪১টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩০ জন ম্রো শিশুকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরসহ ২২৮ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং কমপক্ষে ৩০০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে।

বান্দরবানে রোহিঙ্গা শরণার্থীর অনুপ্রবেশ অব্যাহতভাবে চলছে। বান্দরবান সদর উপজেলাসহ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় নানাভাবে মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। অনুপ্রবেশকালে পুলিশ মাত্র ৬৭ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে। আটককৃতরা কক্সবাজার উখিয়া শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বান্দরবানে অবৈধ অনুপ্রবেশ করছিল। অন্যদিকে ২০২৫ সালে রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গী আরসা-আএসও কর্তৃক নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম থেকে ৩ জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে অপহরণের পর হত্যা করেছে।

অন্যদিকে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিকভাবে জুম্ম শিশুদের ধর্মান্তরকরণ চলছে।

বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার ৪নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড এলাকায় পৌয়ামুহুরীর সীমান্ত ঘেষা ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে ইসলামীকরণ চলছে। গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ নবপ্রতিষ্ঠিত পৌয়ামুহুরীতে সপ্তশীষ মডেল একাডেমি মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে কোমল শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি কক্সবাজারের ঈদগাঁও এলাকার ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত ৩০ ম্রো শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে শিক্ষার কথা বলে মৌলবাদী ও ধর্মব্যবসায়ী একটি চক্র বান্দরবানের আলিকদম, থানচি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে গিয়ে এসব ম্রো শিশুদের ধর্মান্তরিত করে প্রায় গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে।

অপরদিকে ২০২৫ সালে রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী গোষ্ঠী আরসা-আরএসও কর্তৃক দুইজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। ৮ অক্টোবর ২০২৫ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়েনের ৮নং ওয়ার্ড সংলগ্ন গর্জন বনিয়া থেকে সুমন তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক জুমচাষীকে এবং গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া থেকে ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা নামে আরেক গ্রামবাসীকে অপহরণ করে আরএসও ও আরসা জঙ্গীরা। এর আগে গত ১৬ মে ২০২৪ তারিখে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং নাফ নদ ৫ নম্বর স্লুইসগেট এলাকা থেকে ছৈলা মং তঞ্চঙ্গ্যা (২৯) ও ক্যমংখো তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) নামে দুইজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী গোষ্ঠী কর্তৃক অপহরণ করা হয়। বিজিবি ক্যাম্পে অভিযোগ দেয়া সত্ত্বেও বিজিবি কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

৬। নারীর উপর সহিংসতা

২০২৫ সালে সেটেলার বাঙালি, বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক ও ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ, প্রতারণা আরও বেশি জোরদার হয়েছে। ২০২৫ সালে ২৬৮টি ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ২৬টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩২ জন নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ি সদরের সিঙ্গিনালা এলাকায় এক জুম্ম কিশোরীকে তিনজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণ করা হয়। এই ঘটনার জেরে ভুক্তভোগীর পিতা মংসাজাইং মারমা নিজে বাদী হয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এই মামলা করার সময় মামলায় মংসাজাইং মারমা 'ধর্ষণকারীরা সেটেলার বাঙালি যুবক' বলে উল্লেখ করতে চাইলেও কর্তব্যরত পুলিশ কর্মকর্তার পরামর্শে তাকে 'অজ্ঞাতনামা ৩ জন' বলে উল্লেখ করতে হয়। সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে যে, উক্ত গণধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় বাঙালি মুসলিম সেটেলাররা খাগড়াছড়ি সদরে ও গুইমারায় জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা এবং ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে।

গত ২০ জুন ২০২৫ আলিকদম সেনা জোনের উপ-অধিনায়ক মেজর মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ, পিএসসি এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী কর্তৃক বান্দরবান সদর উপজেলার টংকাবতী ইউনিয়নে মুক্তাজন ত্রিপুরা পাড়া গ্রামে পরিচালিত এক সেনা অভিযানে ২ জুম্ম নারী যৌন নিপীড়ন এবং ৩ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনা সদস্যরা জোরপূর্বক প্রথমোক্ত ২ নারীর স্তনসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত দেয়। অপরদিকে আরও তিন গর্ভবতী নারীকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিতে ভিজতে বাধ্য করে।

গত ১০ মার্চ ২০২৫ বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ির খামতাং পাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোঃ জামাল হোসেন (৩২) নামে বহিরাগত এক শ্রমিক কর্তৃক আদিবাসী খিয়াং সম্প্রদায়ের এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৬) ধর্ষণের ঘটনার পর বান্দরবান সেনা জোনের ৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধীন খামতাং পাড়া সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর সারোয়ার ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবারকে সামাজিকভাবে সমঝোতা করতে এবং থানায় মামলা দায়ের না করতে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অভিযুক্ত মোঃ জামাল হোসেন দায়মুক্তি পেয়ে থাকে।

নারীর উপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে নৃশংস ও বর্বরোচিত ঘটনা হচ্ছে একজন খিয়াং গৃহবধুকের ধর্ষণের পর হত্যা করা। গত ৫ মে ২০২৫ বিকেলের দিকে বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ড এলাকায় চিংমা খিয়াং (২৯) নামে এই আদিবাসী খিয়াং নারী বাঙালি শ্রমিক কর্তৃক গণধর্ষণের পর হত্যার শিকার হন। উক্ত ঘটনায় তদন্ত করা তো দূর অস্ত, হত্যার সুরতহাল রিপোর্টও এখনো পর্যন্ত ভুক্তভোগী স্বামীকে প্রদান করা হয়নি। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী ও শিশুদের উপর চলমান সহিংস ঘটনাবলীর ন্যায় বিচার পাওয়া যায়নি এবং ঘটনার সাথে জড়িতদেরকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্যোগে দায়মুক্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে জুম্ম নারীর উপর যৌন সহিংসতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৭। ইউপিডিএফ কর্তৃক নির্যাতন, অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সেনাবাহিনী জুম্মদের মধ্য হতে সুবিধাবাদী, দালাল ও উচ্ছৃঙ্খল কিছু লোককে নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ

সৃষ্টি করে চলেছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউপিডিএফ (প্রসিত), মগপার্টি, বমপার্টি খ্যাত কেএনএফ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলেও জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী উক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপদের লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিষয়ে বানোয়াট অপপ্রচার, হত্যা, অপহরণ বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে একপ্রকার দেউলিয়া হলেও এই বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, চুক্তির পক্ষের নিরীহ লোকজনকে হত্যা, সাধারণ গ্রামবাসীকে মারধর, হয়রানিসহ নানা সন্ত্রাসী কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং বিশেষ করে দেশে-বিদেশে চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা সহ মিথ্যা ও সাজানো তথ্য পরিবেশন করে নানা অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে।

ইদানীং জনসংহতি সমিতির সিনিয়র সদস্যদের মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত করে ইউপিডিএফ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং হলুদ সাংবাদিকদের দিয়ে বিভিন্ন দৈনিকে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। মাদক যেহেতু একটি স্পর্শকাতর বিষয়, তাই সস্তায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের হীনউদ্দেশ্যে এভাবে মাদক ব্যবসার সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করে ইউপিডিএফ বানোয়াট তথ্য প্রচার করে আসছে।

ইউপিডিএফের অপহরণ বাণিজ্যের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে গত ১৬ এপ্রিল ২০২৫ খাগড়াছড়ির গিরিফুল এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থীকে অপহরণ। এই অপহরণের ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে। অপহরণের পর ইউপিডিএফ অপহৃত শিক্ষার্থীদের এক সপ্তাহ ধরে আটকে রাখে। তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক হয়রানি ও হুমকি প্রদান করে। পরে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ইউপিডিএফ অপহৃতদের মুক্তি দেয়।

এছাড়া অপহরণ করে প্রায় সাড়ে ৭ মাস অন্তরীণ রাখার পর সেপ্টেম্বরে মুক্তিপণ ও চাঁদাবাবদ ৬ কোটি টাকার বিনিময়ে রবি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির ৩ কর্মচারীকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিতপন্থী) সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের হাতিমারা গ্রামে একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে ইউপিডিএফ হঠাৎ হানা দিয়ে ৩ নিরীহ জুম্মকে অপহরণ, ৬-৭ ব্যক্তিকে বেদম মারধর এবং ৫০-৬০ জনের মোবাইল ফোন ছিনতাই করে। গত ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ইউপিডিএফ পানছড়ির ধুদুকছড়া থেকে নয়নজ্যোতি চাকমা ও সাগর চাকমা অপহরণ করে। তাদেরকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করা হয়।

ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে পানছড়িতে রূপসী চাকমা (২৬) নামে এক নারী নিহত হন এবং বাঘাইছড়ির বঙ্গলতলীতে একজন শিশু আহত হয়। এছাড়া ১২ মার্চ ২০২৫ সুবলঙে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীদের গুলিতে কমল বিকাশ চাকমা (৪৯) নামে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির এক সদস্য নিহত এবং অপর একজন গ্রামবাসী আহত হন। গত ৫ এপিল ২০২৫ পানছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ইউপিডিএফ থেকে ঝরে পড়া নিষ্ক্রিয় এক কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আগষ্ট মাসে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা ও পানছড়ি উপজেলায় একদিকে সময়ে সময়ে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক ও ভীতিকর সেনা অভিযান এবং অপরদিকে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) এর সন্ত্রাসী কর্তৃক সাজেকে জুম্মদের ২৭টি গ্রামে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা, গ্রামবাসীদের মারধর, জরিমানাসহ নানা নিপীড়ন চালানো হয়। এতে উভয়পক্ষের চাপে পড়ে সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রায় ব্যাপক ভোগান্তি সৃষ্টি হয়।

২০২৫ সালে ২৬৮টি ঘটনার মধ্যে সেনা-সৃষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ৩৩টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৩ জনকে হত্যাসহ ১২২ জন ব্যক্তি ও ২৭টি গ্রামের অধিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মারধর, হত্যা, গুলিতে আহত, তল্লাশি, হত্যার হুমকি, টাকা ও মোবাইল ছিনতাই, চাঁদা দাবি ইত্যাদি ছিল।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জুম্ম জাতি বাসবাস করে আসছে। এই জুম্ম জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগ যুগ ধরে প্রথাগতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সকল আদিবাসী জাতির সামাজিক ব্যবস্থা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রথা ও রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই প্রথা ও রীতিনীতি আদিবাসীদের জাতীয় জীবনে খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথা ও রীতি সর্বদা গতিশীল ও অসীম। তাই প্রথাকে অনড়-অটল ভেবে কোনো এক নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ করা কাম্য নয়। প্রথা সাধারণত অলিখিত হয়ে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় আইন সৃষ্টির পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত আইন বিদ্যমান ছিল এবং এই আইন আদিবাসীদের সংস্কৃতি, জীবনব্যবস্থা ও অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। তাই আদিবাসীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে আদিবাসীদের প্রথাগত আইন প্রাধান্য পাওয়া বাঞ্ছনীয় ও অত্যাবশ্যক।

পাহাড়ে আদিবাসীদের প্রথাগত আইন বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইনের ক্ষেত্রে যেমন– ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৮৯, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন-২০১৬ এবং ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা বহু দশক ধরে চলমান। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনামলে সম্পূর্ণ শাসন বহির্ভূত অঞ্চল হিসেবে গণ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রশাসন ১৮৬০ থেকে এই অঞ্চলে বিশেষ আইন তৈরি করে সাধারণ সমতলাঞ্চলের আইনের আওতার বাইরে রাখে। যার ফলে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুযায়ী জুম্মদের ঐতিহ্যবাহী জমি ও বনভূমি সম্পর্কে স্থানীয় রাজা-হেডম্যানদের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এতে জমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। ফলে ব্রিটিশ আমলে জুম্মদের জমি-অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ছিল এবং তারা নিজস্ব নিয়মে ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছিল।

পাকিস্তান আমলে আংশিক স্বতন্ত্র মর্যাদা বজায় থাকলেও কিন্তু ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৩৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে আদিবাসীদের জমির ঐতিহ্যবাহী অধিকারে প্রথম আঘাত হানে। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে সেই বছরই হাইকোর্টের রায়ে পার্বত্য অঞ্চলে ওপেনিং দেওয়া হয় অর্থাৎ বহিরাগতদের জন্য পাহাড়ের স্থায়ী বসবাসের পথ খুলে দেওয়া হয়। পরে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের শাসকরাও পাকিস্তানের দেখানো একই পথে হাঁটতে থাকে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাচীন প্রথাগত স্বত্বগুলো বহুলাংশে স্বচ্ছতা হারায় এবং জুম্মদের জমির উপর বহিরাগত ও রাষ্ট্রীয় দখল একচেটিয়াভাবে বাড়তে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের কাছ থেকে কোনোরূপ পরামর্শ না নিয়ে তৈরি করে। এই বাঁধের কারণে জুম্মরা প্রায় ৫৪,০০০ অধিক একর উর্বর জমি হারায় এবং আনুমানিক ১ লক্ষাধিক আদিবাসী নিজেদের ভূমি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের আমলে ১৯৭৯-১৯৮৪ সালের মধ্যে দেশের শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় গোপনভাজন 'ট্রান্সমাইগ্রেশন' নীতি অনুযায়ী প্রায় ৪ লক্ষেরও বেশি সেটেলার বাঙালি পাহাড়ে বসতিপ্রদান করা হয়।

বলা যায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় জুম্মদের নিজেদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ, গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা পরিচালনা করে তাতে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামে রূপান্তর করা হয়েছিল এবং এইসব গুচ্ছগ্রাম সর্বত্রই সেনাবাহিনীর পাহারায় নিয়ন্ত্রিত থাকত। মূলত পাহাড়ের ভূমি সমস্যার সৃষ্টির মূল কারণ এই সেটেলার বাঙালিদের বসতিপ্রদানের মধ্যে দিয়ে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তির প্রথম খন্ডে ১ নং ধারায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ হিসেবে 'উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা' হিসেবে রাখার অঙ্গীকার করা হয়। এই সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে।

তদুপরি শাসকগোষ্ঠীর বিভিন্ন মহল ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক আদিবাসীদের অবৈধভাবে দখল হওয়া ভূমি ফেরত দেওয়া এবং স্ব স্ব ভূমি প্রত্যর্পণ পূর্বক ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পাহাড়ে জুম্মদের মনে আশা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু আজ চুক্তির ২৮ বছরের অধিক পূর্ণ হলেও এখনো চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। যার কারণে পাহাড়ে প্রতিনিয়ত প্রশাসনের সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক বেদখল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিধিমালা প্রণয়ন না হওয়ার কারণে ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে জুম্মদের উপর সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলা ও জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ অব্যাহতভাবে চলছে। ফলে জুম্মরা দিন দিন প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

১৯৯৯ সাল থেকে এই কমিশন বেশ কয়েকবার গঠন ও পুনর্গঠিত হলেও এর কার্যক্রম প্রায় স্থবির। বিগত প্রায় ২৮ বছরেও পাহাড়ে ভূমি বিরোধ সমাধানে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যায়নি। বিশেষ করে ২০১৬ সালে সংশোধনী আইন হলেও কমিশনের মাত্র কয়েকটি বৈঠক হয়েছে এবং সেই বৈঠকে অনেক সিদ্ধান্তই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে প্রায় ২৬ হাজারেও অধিক ভূমি বিরোধের আবেদন ভূমি কমিশনের অফিসে জমা রয়েছে। ২০১৬ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১'-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন করা হয়। আইনটি সংশোধনের পর ২০১৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তরফ থেকে ভূমি কমিশনের বিধিমালা খসড়া করে চূড়ান্ত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়। কিন্তু তারপর থেকে উক্ত বিধিমালা সরকার ঝুলিয়ে রেখে চলেছে। এই বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় ভূমি কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ এখনো শুরু করতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন কর্তৃক সভা আহ্বান করা হলে বরাবরই সেনামদদপুষ্ট উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সেটেলার সংগঠন কর্তৃক বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নানা ষড়যন্ত্র পরিচালনা করা হয়। এই সময় সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদের হুমকিতে ভূমি কমিশনের সভা কয়েকবার স্থগিত করতে হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর গঠিত হওয়ার সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশনের ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বান্দরবানে আহুত বৈঠকের বিরুদ্ধে সড়ক অবরোধ ডাক দেয়। ফলে ভূমি কমিশনের উক্ত বৈঠক যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের পূর্ব-নির্ধারিত বৈঠক ভন্ডুল করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে আহুত ভূমি কমিশনের সভা ঘেরাও করে এই পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক পরিষদ। এ সময়ে নাগরিক পরিষদের প্রতিবাদকারীদের প্রতিরোধ না করে আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী তাদের প্রতি প্রকারান্তরে সমর্থন ও মদদ দেয়।

এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিলে উক্ত সভা প্রতিহত করাসহ ৭ দফা দাবিতে ৬ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) সকাল ৬:০০ টা থেকে ৭ সেপ্টেম্বর (বুধবার) দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত রাঙ্গামাটি শহর এলাকায় টানা ৩২ ঘন্টা হরতালের ডাক দেয় সেটেলারদের এই সন্ত্রাসী সংগঠন। ফলে ভূমি কমিশনের উক্ত বৈঠকও স্থগিত করা হয়।

সর্বশেষ সেনামদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিদের ছাত্র সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদ (পিসিসিপি) এর হরতালের হুমকিতে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ রাঙ্গামাটিতে আহুত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা স্থগিত হয়েছে।

সম্প্রতি ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভূমি মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে তিন পার্বত্য জেলার ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। যা সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই প্রজ্ঞাপনে ধান্য জমি বা ১ম শ্রেণি জমির খাজনা ৫০ টাকা, পাউন্ডি বা ২য় শ্রেণি জমির ৩০ টাকা এবং পাহাড় (গ্রোভল্যাণ্ড) বা ৩য় শ্রেণি জমির খাজনা ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং চুক্তি মোতাবেক প্রণীত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং জমির খাজনা আদায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত। কিন্তু উক্ত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে জমির খাজনা বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বেআইনী ও চুক্তি বিরোধী। এটা সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে জারি করা হয়েছে।

এই ধরনের রাষ্ট্রের একতরফা সিদ্ধান্ত পাহাড়ের সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সংকট নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই অঞ্চলটি যদিও বাংলাদেশের ভৌগোলিকভাবে বৃহত্তম কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সংবেদনশীল অঞ্চল। এই অঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ভূমি সমস্যা। ভূমির মালিকানা, জোরপূর্বক দখল ও নিয়ন্ত্রণই জুম্মদের ও রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মূল উৎস। পাহাড়ে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক উন্নয়নের বয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠেছে, যেখানে অবকাঠামো

ও পর্যটনের নামে ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক পণ্যায়ণ রূপান্তর করার মধ্য দিয়ে জুম্মদের মূল সংস্কৃতির তাৎপর্য হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিতে রয়েছে। পর্যটন স্থাপনা, ইকোপার্ক, রিজার্ভ ফরেস্ট, সড়ক ও সামরিক স্থাপনা নির্মাণ-এসব প্রকল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জুম্মদের ভূমি জোরপূর্বক দখলের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্যতম দিক। ভূমি মানে কেবল জমি নয়, এটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা কৌশল ও সংখ্যাগত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এই বাস্তবতায় দিন দিন জুম্ম জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়াচ্ছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনকে কেবল কাগজে সীমাবদ্ধ না রেখে কার্যকর করা, ভূমি কমিশনকে স্বাধীন ও সক্রিয় করা, ভূমি কমিশনের বিধিমালা শীঘ্রই প্রণয়ন করা এবং জুম্ম জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া এই সংকটের সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং ভূমি সমস্যার সমাধান ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি কেবল একটি অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতি হয়েই থেকে যাবে। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি সমস্যা সমাধান করা অত্যন্ত জরুরি।

> আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*

বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ে সহিংসতার বৃত্তে জুম্ম নারী: অধিকার বঞ্চনা থেকে সহিংসতার বাস্তবতা

পার্বত্য চট্টগ্রামে দশকের পর দশক ধরে জুম্ম নারীদের ইতিহাস কেবল বঞ্চনার নয় বরং চরম প্রতিকূলতার মাঝে টিকে থাকা এবং প্রতিরোধের ইতিহাস। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিকায়ণ এবং ভূমি বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে জুম্ম নারীরা যে সহিংসতার শিকার হয়েছেন তার রূপ বহুমাত্রিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীদের ইতিহাস কেবল নিপীড়নের নয়- এটি একই সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষা, সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা এবং ন্যায়বিচারের সংগ্রামের ইতিহাস। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৪ জাতিগোষ্ঠীর ভিন্নভাষাভাষী সমগ্র জনগোষ্ঠী 'জুম্ম' নামে অধিক পরিচিত। দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রের উপনিবেশিক শাসনের দমন-পীড়নের কারণে জুম্মরা বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ৭০-৯০ দশক অবধি জুম্ম জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবিতে তাদের সংগ্রাম জোরদার করে। এই সময় পাহাড়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ৪-৫ লক্ষাধিক বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। যাদেরকে 'সেটেলার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই বসতিস্থাপন পরিকল্পনার পর পরই পাহাড়ে আদিবাসীদের উপর ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন শুরু হয়। যার সরাসরি অতিমাত্রায় প্রভাব পরে জুম্ম নারীদের উপর। এই সময় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা জুম্ম নারীদের উপর নির্বিচারে অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতো জঘন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে, ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় রাখা হলেও ভূমি-নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হয়। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে হাজার হাজার জুম্ম নিজেদের বসতভিটা থেকে বাস্তুচ্যুত হন। এই বাস্তুচ্যুতি জুম্মদের শুধু ভৌগোলিক স্থানচ্যুতি ছিল না; এটি ছিল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙনের সূচনা। এই বাস্তুচ্যুতি জুম্ম নারীদের জীবনে বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে। তার মধ্যে অন্যতম নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বন্ধনের ভাঙন এবং সীমান্ত পেরিয়ে শরণার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের অস্তিত্বকে অনিশ্চিত করে তোলে।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের স্ব-শাসনের দাবি জোরদার করা হয়। এই সময় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচনার প্রাক্কালে পাহাড়ের গণমানুষের অধিকারের প্রশ্নে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে একদল প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলে শেখ মুজিব হুমকি দিয়ে বলেন, লারমা বেশি বাড়াবাড়ি করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক লাখ নয়, দুই লাখ, পাঁচ লাখ, নয় লাখ বাঙালি ঢুকিয়ে দেব। এই কথাগুলির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের সদ্য রচিত সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদের উপর সংশোধনী প্রস্তাবে যেখানে উত্থাপন করা হয়, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন।' উল্লেখ্য, এম এন লারমা সেদিন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেছিলেন।

এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস)। তখন এই সংগঠনের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। এই সময় পাহাড় ব্যাপক সামরিকীকরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়।

এই সময়ে জুম্ম নারীরা দ্বিমুখী সহিংসতার শিকার হন। একদিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলার বাহিনী দ্বারা নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার, অন্যদিকে জুম্ম সমাজে সামন্তীয় প্রভুত্বের অত্যাচারের চাপ– এই দুইয়ের মাঝখানে তারা অনিরাপদ জীবনযাপন করেন। সেই সময় সেনাবাহিনীর মদদে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের গ্রাম পোড়ানো, ধরপাকড়, গুম ও জুম্ম নারীদের ধর্ষণ, ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যা অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। এই সময় জুম্ম নারীর শ্লীলতাহানিকে জুম্মদের অধিকার আদায়ে নিয়োজিত কর্মীদের ভীত বা অপমান করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। যার ফলে সহিংসতা কেবল শারীরিক নয়- তা সামাজিক মর্যাদা, মানসিক সুস্থতা ও জুম্ম সমাজের কাঠামোকে চরমভাবে আঘাত হানে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থার রূপধারা পুরুষতান্ত্রিক হলেও অন্য অনেক সমাজের তুলনায় জুম্ম নারীরা স্বকীয় ও চলাচলে তুলনামূলক স্বাধীন হয়ে থাকেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের ভূমিকা বড়, কিন্তু উচ্চশিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতা

পুরুষদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় সমগ্র নারীদের জন্য পদক্ষেপ থাকলেও আদিবাসী নারীদের স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জ আলোচনায় সঠিকভাবে উল্লেখ ছিল না। বিগত সময় হতে আজ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীদের বিরুদ্ধে যৌন ও শারীরিক নির্যাতনের প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

এই সময় ২০০৭-২০১৫ সাল পর্যন্ত জুম্ম নারীদের ওপর মোট ৪৩৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ২০১৫-২০২৫ সাল পর্যন্ত জুম্ম নারীদের উপর মোট ২৬৭টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এইসব তথ্যই ইঙ্গিত দেয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম নারীরা গৃহসহিংসতা নয় বরং সাম্প্রদায়িক হামলা, বহিরাগত সেটেলার বাঙালি কর্তৃক নিপীড়ন ও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ২০২৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় ৩০০ একর ভূমি বেআইনিভাবে বেদখল করা হয়েছে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালে জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে ২৬৮টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যার শিকার হয়েছেন ৬০৬ জন জুম্ম। প্রতিবেদনে আরো উঠে আসে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি বড় অংশ বিচারবহির্ভূত হত্যা, গ্রেপ্তার, অবৈধ তল্লাশি, জুম্ম নারী এবং শিশু উপর যৌন সহিংসতার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে দৃষ্টি রাখলে, সেপ্টেম্বর-২০২৫ খাগড়াছড়ির ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানে ১২ বছর বয়সী এক মারমা ছাত্রীকে বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক গণধর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র-জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভের ডাক দেয়। এই সময় ১৪৪ ধারা জারি এবং প্রশাসনিক চাপ থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভ থেমে যায়নি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালি এবং জুম্মদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হামলা ছড়িয়ে পড়ে। এতে তিনজন জুম্ম নিহত এবং শতাধিক আহত ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয়। যার বিচার এখনো করা হয়নি।

অন্যদিকে একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত সেটেলার বাঙালি কর্তৃক চিংমা খিয়াংকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই ঘটনার তদন্তের গতি অত্যন্ত ধীর এবং ধর্ষণের পর হত্যার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট এখনও হস্তান্তর করা হয়নি। একটি অপরাধমূলক ঘটনার আলামতের ভিত্তিতে বাদি পক্ষের মামলা করার যে স্বাভাবিক বিচারিক প্রক্রিয়া চলে, চিংমা খিয়াং ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ডে তা হয়নি। যেমন এ ঘটনার প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও মামলাও করা যায়নি সুরতহাল রিপোর্ট না পাওয়ার কারণে।

তাহলে প্রশ্ন আসে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই যাবতকালে সংঘটিত নারীর উপর সহিংসতার ঘটনাগুলির কোন বিচার হয় না কেন? কল্পনা চাকমা, তুমা চিং মারমা, চিংমা খিয়াং, সুজাতারা কেন বিচার পায় না? কেন পাহাড়ের হাজার হাজার একর ভূমি বেদখল হয়? কেন পাহাড়ে আজও ভূমি বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘাত চলে? কেন পাহাড়ে আজও ভূমি সমস্যা সমাধান করা হয়না? এইসব প্রশ্নের উত্তর আজও নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। এই রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেখানে জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী অধিবাসীদের স্বশাসন, বাস্তুচ্যুত জুম্মদের জমি প্রত্যাবর্তন এবং বিশেষ মর্যাদার পুনর্বাসন ব্যবস্থার বিধান করা হয়। এ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন কার্যকর, 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার পুর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামকে বেসামরিকীকরণ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করা, সার্কেল চীফ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন করা ইত্যাদি বিধানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সদিচ্ছা না হওয়ার কারণে চুক্তির অধিকাংশ মৌলিক ধারা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

আজ চুক্তির প্রায় ২৮ বছরের অধিক হতে চলেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের পরিবর্তে বিগত সরকার ব্যাপক সামরিকায়ণ করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়নের মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের নীতি গ্রহণ করেছিল। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। আর এই দমন-পীড়ন ও সেনা নিপীড়ন-নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবচে নিরাপত্তাহীনতায় আছেন জুম্ম নারী সমাজ। ফলে আজ জুম্ম নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। জুম্ম নারীর উপর সহিংসতাকে জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মলীকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত করছে শাসকগোষ্ঠী।

বর্তমানে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে তারা সরকার গঠন করে। বলা বাহুল্য, যে দল ফ্যাসিবাদী সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সেই দলই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ঘ খন্ডের ১৯ নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন জুম্ম মন্ত্রীর পাশাপাশি প্রতিমন্ত্রী মর্যাদার একজন অউপজাতীয় ব্যক্তিকে সেখানে বসানো হয়েছে। যা সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লঙ্ঘন। তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয়, বহু প্রতীক্ষার পর বিএনপির ক্ষমতার অধিগ্রহণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নব দিগন্তের যে সূচনা হয়েছে, তাতে নির্বাচনের আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনে আশা আকাঙ্ক্ষার যে প্রতিফলন জুম্ম জনগণের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তা এক নিমেষে ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘনের মাধ্যমে।

বর্তমান সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীরা পদে পদে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীর ইতিহাস কেবল নির্যাতন ও বঞ্চনার ইতিহাস নয়– এটি প্রতিরোধ, অভিযোজন ও আত্মমর্যাদার ইতিহাস। সহিংসতার বৃত্ত তাদের জীবনকে বহুবার বিপর্যস্ত করেছে, কিন্তু তারা প্রতিবারই নতুনভাবে দাঁড়িয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীরা এখন শুধুমাত্র নির্যাতিত নয়– তাঁরা সংগঠিত ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা বর্তমানে নিজেদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে লড়াই করে যাচ্ছেন।

পরিশেষে অতীতের ক্ষত, বর্তমানের সংগ্রাম এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে জুম্ম নারীরা আজও পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাদের অভিজ্ঞতা বোঝা মানে কেবল একটি অঞ্চলের ইতিহাস জানা নয় বরং রাষ্ট্রের শাসন প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক জটিলতার সমীকরণ সম্পর্কে অনুধাবন করা।

> “জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।”
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন নির্যাতন

দীঘিনালার নাড়াইছড়িতে সেনাবাহিনীর অভিযান, এলাকাবাসীর মধ্যে নানা আশঙ্কা, উদ্বেগ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬০-৬৫ জনের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকা নাড়াইছড়িতে টহল অভিযান চালায়। প্রায় ১০ দিন ধরে ঐ এলাকার বিভিন্ন জুম্ম গ্রামে ও জঙ্গলে এই অভিযান চালানো হয়।

গত ৩১ অক্টোবর ২০২৫, দুপুর ১২টার দিকে দীঘিনালা সেনা জোন হতে ওই সেনা সদস্যরা ৯টি গাড়িযোগে মাইনীর ধনপাতা এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে সেনা অভিযান শুরু করে। সেখান থেকে একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে সেনা সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। দীঘিনালা সেনা জোনের এক মেজর, একজন লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন আব্দুলাহ আল আমিন, জারুলছড়ি সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মহিদুল ইসলাম এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন বলে জানা গেছে। এই অভিযান নভেম্বর ২০২৫ প্রথম সপ্তাহের কয়েকদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সেনাবাহিনীর এই অভিযানের ফলে জনগণের মধ্যে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় জনগণের স্বাভাবিক জীবনধারায় ব্যাপক ব্যাঘাত হয় এবং তাদের মধ্যে নানা আশঙ্কা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। তাদের আশঙ্কা, সেনাবাহিনী ঐ এলাকায় নতুন করে বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প স্থাপনের পাঁয়তারা করছে। সেনাদলের সদস্যরা ইতোমধ্যে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পর প্রত্যাহারকৃত সেনা ক্যাম্পের পুরাতন জায়গাগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে বলে গ্রামবাসীর সূত্রে জানা গেছে।

ইতিমধ্যে বাবুছড়ার মাইনী নদীর নিকটবর্তী ধনপাদা বৌদ্ধ বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে সেনাবাহিনী একটি নতুন হেলিপ্যাড স্থাপন করেছে বলেও খবর পাওয়া গেছে। সেনাবাহিনী ধনপাদা বটতলা, গগণ কার্বারি পাড়া, উগুদোছগি, ধীরেন পাড়া, চাদারাছড়া ইত্যাদি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছে বলে জানা গেছে।

পরে নাড়াইছড়িতে অবস্থান করে সেখান থেকে মাইনীর উজানে আজাছড়া, উত্তর বাঘাইহাট ও দক্ষিণ বাঘাইহাট, হুগিছড়া ও নাড়াইছড়ি বাজারের পূর্ব দিকে নাড়াইছড়ি নদীর উজানে কয়েকটি এলাকায় নিয়মিত টহল অভিযান চালানো হয় বলে জানা গেছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করে বলে জানা গেছে।

বাঘাইছড়ির বঙ্গলতলীতে ৪ গ্রামবাসীর বাড়িতে সেনাবাহিনীর হয়রানিমূলক তল্লাশি

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নের উত্তর বঙ্গলতলী মিঠু কার্বারি পাড়া ও উত্তর বি ব্লকের রবিশংকর কার্বারি পাড়া এলাকায় চার গ্রামবাসীর বাড়িতে সেনাবাহিনী হয়রানিমূলক তল্লাশির খবর পাওয়া গেছে। গত ৩ নভেম্বর ২০২৫ ভোর ৪:১৫টার সময় এ তল্লাশির ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত ২ নভেম্বর বেলা ১:৩০টায় বাঘাইহাট সেনা জোন থেকে ৪টি সেনা পিকআপে করে একদল সেনা সদস্য করেঙ্গাতলী ক্যাম্পে এসে অবস্থান নেয়। পরে রাত ১০:৩০টার সময় আরো ৪টি পিকআপে করে আরেক দল সেনাসদস্য করেঙ্গাতলী ক্যাম্পে এসে যোগ দেয়।

এরপর ৩ নভেম্বর ভোর ৪:১৫টায় সেনারা করেঙ্গাতলী ক্যাম্প থেকে উত্তর বঙ্গলতলী এলাকায় গিয়ে গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি ও দোকানে হয়রানিমূলক তল্লাশি চালায়। তল্লাশির শিকার ব্যাক্তিরা হলেন–

১. রিটন চাকমা (২৮), পিতা- লব মনি চাকমা, গ্রাম: মিঠু কার্বারি পাড়া, উত্তর বঙ্গলতলী (তার বাড়ি ও দোকানে তল্লাশি চালায় সেনাবাহিনী);
২. হান্নোরাম চাকমা (৬০), পিতা- মৃত বৃগুধর চাকমা, গ্রাম- নিক্কো কার্বারি পাড়া, উত্তর বঙ্গলতলী
৩. পুষ্পকান্তি চাকমা (৩৬), পিতা- মৃত বাচ্চা চাকমা, গ্রাম- রবিশংকর কার্বারি পাড়া, উত্তর বঙ্গলতলী
৪. স্বপন কুমার চাকমা (৫৭), পিতা- অজ্ঞাত, গ্রাম- রবিশংকর কার্বারি পাড়া, উত্তর বঙ্গলতলী।

বন্দুকভাঙ্গায় সেনা অভিযান, ঘরবাড়ি তল্লাশি ও জিনিসপত্র তছনছ

গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ দুপুর ২:৩০ টার দিকে হারিক্ষ্যং ক্যাম্প থেকে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে ৩০ জনের একটি সেনাদল বন্দুকভাঙার কুরামারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়।

পরে সেখান থেকে সন্ত্রাসী খোঁজার নামে আশেপাশের এলাকা ও গ্রামের গ্রামবাসীদের নানারকম হয়রানিমূলক জিজ্ঞাসাবাদ, বাড়িঘর তল্লাশি ও হুমকি প্রদান করে।

বাঘাইহাট জোনের ডিজিএফআই সদস্য কর্তৃক ফাঁকা গুলি বর্ষণ, জনমনে আতঙ্ক

রাঙামাটির বাঘাইহাট জোনের ডিজিএফআইয়ের দুই সদস্য কর্তৃক বাঘাইহাট-দীঘিনালা সড়কের জোড়াব্রীজ এলাকায় ফাঁকাগুলি বর্ষণের ফলে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত ৬ নভেম্বর ২০২৫ বিকালে দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের জোড়াব্রীজ এলাকার বড়ইতলী ফাঁকা গুলিবর্ষণের ঘটনানি ঘটে।

জানা যায়, বিকাল ৩টার সময় বাঘাইহাট জোন থেকে ডিজিএফআই সদস্য মোঃ হুমায়ুন ও মো. ইশহাক একটি মোটর সাইকেলে করে দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নের জোড়াব্রীজ এলাকার বড়ইতুলি নামক স্থানে যায়। সেখানে যাওয়ার পর পরই তারা নিজেদের কাছে থাকা পিস্তল দিয়ে ৩-৪ রাউন্ড ফাঁকাগুলি ছোঁড়ে। এতে হঠাৎ গুলির শব্দে স্থানীয় সাধারণ জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

সাজেকে সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি বৌদ্ধ বিহারের সাইনবোর্ড খুলে ফেলার নির্দেশ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে সেনাবাহিনী একটি বৌদ্ধ বিহারের সাইনবোর্ড জোরপূর্বক খুলে ফেলার নির্দেশ দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ সকালে সাজেক ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের হাজাছড়া বৌদ্ধ বিহারে এ ঘটনাটি ঘটে।

জানা যায়, সেদিন সকাল ৮টার সময় গঙ্গারাম ছৌদগীছড়া সেনা ক্যাম্প থেকে ১৩ জনের একদল সেনা সদস্য হাজাছড়ি বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশ করে। এরপর বিহারে থাকা দায়ক অনিল চাকমা (৪৫) ও দায়িকা রিতা চাকমাকে (৩৫) ডেকে বিহারের সাইনবোর্ড খুলে ফেলতে বলে। কিন্তু তারা সাইনবোর্ড খুলতে অপারাগতা প্রকাশ করলে সেনারা বন্দুক তাক করে জোরপূর্বক সাইনবোর্ড খুলতে বাধ্য করে।

পরে সেনা সদস্যরা কজোইছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাশ চলাকালীন গিয়ে সহকারী শিক্ষক সাধন চাকমা ও মিহির চাকমাকে ডেকে দায়িত্বরত সেনা কমাণ্ডার বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কোন অসুবিধা হলে বাঘাইহাট জোন কর্তৃপক্ষকে অবগত করতে বলেন।

আধা ঘন্টার পর সেনারা আবার অনিল চাকমা ও রিতা চাকমাকে গঙ্গারাম খালের পাড়ে ডেকে নিয়ে যায়। সেখানে সেনা সদস্যরা নিজেদের একটা এন্ড্রয়েড মোবাইল দিয়ে নানান ভঙ্গিতে ছবি তুলতে রিতাকে বাধ্য করে এবং ছবি তোলার 'পারিশ্রমিক' হিসেবে তাকে (রিতাকে) ৫০ টাকা দিয়ে ক্যাম্পে চলে যায়।

পানছড়ির তারাবন এলাকায় ২ গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনীর নির্যাতন

গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ বেলা ২টার দিকে প্রথমে ৩৫ জনের একদল সেনা সদস্য পায়ে হেঁটে তারাবন গির্জা এলাকায় প্রবেশ করে। এরপর ৬টি গাড়িতে করে আরো একদল সেনা সদস্য সেখানে গিয়ে যোগ দেয়। সেনারা গ্রামের লোকজনকে এক প্রকার জিম্মি করে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করে এবং যাকে সামনে পেয়েছে তাকে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করে হয়রানি করে। পরে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে সেনারা দুই গ্রামবাসীর ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়।

নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা হলেন– নিকেল চাকমা (৩৩) ও টাত্তে খুলো চাকমা (৪২)। সেনারা সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থানের পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় সেখান থেকে চলে গিয়ে মনিপুর এলাকায় অবস্থান নেয়।

বাঘাইছড়িতে বিজিবি কর্তৃক জুম্মদের প্রায় ১০০০ ঘনফুট সেগুন কাঠ অন্যায়ভাবে জব্দ

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতুলি ইউনিয়নের সারোয়াতুলি মৌজা থেকে জুম্ম গ্রামবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কর্তন করা আনুমানিক এক হাজার ঘনফুট সেগুন কাঠ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক অন্যায়ভাবে জব্দ করে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল আনুমানিক ৮ টার দিকে রাঙামাটির লংগদু উপজেলার রাজনগর জোনের (৩৭ ব্যাটালিয়ন বিজিবি) সিইও মোঃ তাসকিনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জনের একটি বিজিবি দল বাঘাইছড়ি উপজেলার দক্ষিণ-পূর্ব সারোয়াতুলি ইউনিয়নের কুমুরোআরক ছড়া এলাকায় টহল অভিযান চালায়। পরে তারা উক্ত এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীদের আগে থেকে কর্তন করে রাখা আনুমানিক ১০০০ ঘনফুট সেগুন কাঠ জব্দ করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

গ্রামবাসীরা জানান, সারোয়াতুলি মৌজার অন্তর্ভুক্ত ১২ থেকে ১৫টি গ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে যৌথভাবে একটি পাড়াবন সংরক্ষণ করে আসছিল। মূলত খরা মৌসুমে যাতে স্থানীয়দের পানিসংকট দেখা না দেয়, সে উদ্দেশ্যেই তারা এই পাড়াবন সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিল।

তাদের দাবি, উক্ত পাড়াবনে অতিরিক্ত সেগুন গাছ থাকার কারণে বিগত কয়েক বছর ধরে ঝিরির পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছিল। যেহেতু সেগুন গাছ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়, তাই গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অতিরিক্ত সেগুন গাছ কর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই

কাঠ বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ গ্রামগুলোর বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার পরিকল্পনাও ছিল।

এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে কয়েকদিন ধরে ১২ থেকে ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা মিলিতভাবে সেগুন গাছ কর্তন করে বিক্রির উদ্দেশ্যে সারোয়াতুলি মৌজার কুমুরোআরক ছড়া এলাকায় কাঠগুলো জড়ো করে রেখেছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, ঘটনার দিন ১২-১৫ গ্রামের মুরুব্বিরা বিজিবি সদস্যদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অনুনয়-বিনয় করলেও তারা গ্রামবাসীদের কোনো কথা আমলে নেননি। পরে ঐদিন রাত আনুমানিক ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে বিজিবি সদস্যরা কাঠগুলো তুলে নিয়ে যান।

এ ঘটনায় স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

তারা অভিযোগ করেন, কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ, আলোচনা বা আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই কাঠগুলো জব্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্থানীয় সূত্র দাবি করেছে যে, এই অভিযানে সারোয়াতুলি বিজিবি ক্যাম্প ও শিজক বিজিবি ক্যাম্পের সদস্যরাও জড়িত ছিলেন।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক দুই জুম্মর নির্মাণাধীন বসতবাড়ি ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ির উপজেলার গাছবাগান পাড়া এলাকায় দুই জুম্মর নির্মাণাধীন বসতবাড়ি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভুক্তভোগীরা হলেন– ১) সুখময় চাকমা, পীং: দয়াল চাকমা; ও ২) ধনেশ্বর চাকমা, পীং: অজ্ঞাত।

সূত্র মোতাবেক, গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ সেনাবাহিনীর ২৬-ইসিবির মেজর আতিক ও সুবেদার মোশারফের নেতৃত্বে উক্ত দুই জুম্মর ২টি নির্মাণাধীন বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সময় সেনাবাহিনী উক্ত গাছবাগান পাড়া এলাকায় সাজেকের মতই একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেখানকার স্থানীয় জুম্মদের উচ্ছেদের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে বলে জানা যায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক আবারও এক জুম্মর জুম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার গাছবাগান পাড়া এলাকায় আবারও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক এক জুম্মর আধা-কাঁচা জুম পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী জুমচাষী হলেন: সুখময় চাকমা, পীং: দয়াল চাকমা।

উল্লেখ্য, এর আগেও একই স্থানে গত ২৪ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর ২৬-ইসিবির মেজর আতিক ও সুবেদার মোশারফের নেতৃত্বে দুই জুম্মর ২টি নির্মাণাধীন বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় জুম্মদের বাধা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর ২৬-ইসিবি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার লক্ষ্যে থুম পাড়া, ধুলুবাগান ও গাছবাগান এলাকার জুম্ম গ্রামবাসীদের ভোগদখলীয় ভূমি, জুমভূমি, পাড়াবন ইত্যাদি দখল করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

উক্ত কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক একদিকে যেমন সেখানকার স্থানীয় জুম্মদের নানাভাবে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, অপরদিকে পর্যটনের নামে অবাধে পাহাড় কেটে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যস্ত করে তোলা হচ্ছে।

থানচিতে ব্যাপক সেনা অভিযান, জনমনে আতঙ্ক

বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার ৪ নং বলিপাড়া ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ ঘটিকার সময় হতে জ্ঞানলাল পাড়া, ব্রহ্মদত্ত পাড়া ও ক্যচুপাড়ায় আনুমানিক ১০০-১২০ জনের সেনা ও

বিজিবির সদস্য ব্যাপকহারে টহল ও হয়রানিমূলক তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেছে।

সূত্র মোতাবেক, আলিকদম সেনা জোন এবং বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি) ক্যাম্প হতে ১০০-২০০ জনের সেনা ও বিজিবি সদস্যরা জ্ঞানলাল পাড়ায় ২০-৩০ জন, ব্রহ্মদত্ত পাড়ায় ৩০ জন ও ক্যচুপাড়ায় আনুমানিক ৪০-৫০ জন করে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত পাড়াগুলোতে সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর হয়রানিমূলক তল্লাশি অভিযান এবং ড্রোন উড়ানো হয় বলে জানা যায়।

উক্ত রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত, ব্রহ্মদত্তপাড়া, ক্যচুপাড়া এবং জ্ঞানলাল পাড়ায় সেনাবাহিনী ও বিজিবি সদস্যরা অবস্থান করেন এবং জাইজুড়ি মোন নামক এলাকায় অস্থায়ী ক্যাম্প বসিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করার খবর জানা যায়। এই সময় উক্ত জায়গায় অবস্থান করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় রসদ এবং জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য গ্রামবাসীদের নানাভাবে জোরজবরদস্তি করা হয় বলেও খবর পাওয়া গেছে।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

মিলন তালুকদার নামে একজনকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক অপহরণ

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার নান্যাচর উপজেলার রামহরি পাড়া থেকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) কর্তৃক মিলন তালুকদার নামে একজন জুম্মকে অপহরণ করা হয়েছে। গত ৩১ অক্টোবর ২০২৫ রাত ১২ ঘটিকায় অপহরণের ঘটনাটি ঘটেছে। মিলন তালুকদারের বাড়ি রাঙ্গামাটি পৌরসভার পুর্ব ট্রাইবেল আদামে।

অপহৃত মিলন তালুকদার রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অংশৈপ্রু চৌধুরীর বাসার ব্যক্তিগত সচিব (পিএস) ছিল বলে জানা গেছে। মিলন তালুকদার রামহরি পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে সেখান থেকে তিনি অপহরণের শিকার হন। অপহরণের পর ০১ নভেম্বর ২০২৫ তার স্ত্রী কুয়েলী চাকমার নিকট ফোন করে ইউপিডিএফ ৭৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে মর্মে জানা যায়। কুয়েলী চাকমা ভূয়াদাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

রাজবিলায় মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা

গত ৯ জানুয়ারি ২০২৬ সেনা-মদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের থংজামা পাড়া গ্রামে নিসাঅং মারমা (৫৫) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, সন্ত্রাসীরা প্রথমে নিসাঅং মারমাকে অপহরণ করার চেষ্টা করে।

সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিসাঅং মারমা আহত হলেও ধস্তাধস্তির কারণে আক্রমণকারী দুই সন্ত্রাসীও নিজেদের গুলিতে আহত হয় বলে জানা যায়। তবে আহত সন্ত্রাসীদের নাম জানা যায়নি। হামলাকারী সন্ত্রাসীদের হাতে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলেও জানা গেছে।

হামলার শিকার নিসাঅং মারমা পেশায় একজন স্থানীয় দোকানদার। তবে তিনি একসময় জনসংহতি সমিতির কর্মী ছিলেন বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন (৯ জানুয়ারি) সকালে থংজামা পাড়ায় নিসাঅং মারমা প্রতিদিনের মত তার মুদির দোকান খুলতে গেলে মগ পার্টির ৪ সশস্ত্র সদস্য তার নাম জিজ্ঞেস করে তাকে ঝাপটে ধরার চেষ্টা করে। এ সময় নিসাঅং মারমার সাথে মগ পার্টির সদস্যদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। এসময় মগ পার্টির এক সদস্য নিসাঅং মারমাকে গুলি করার চেষ্টা করলে ধস্তাধস্তির কারণে সেই গুলিতে দুই মগ পার্টির সদস্য আহত হয়। এই সুযোগে নিসাঅং মারমা দৌঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করা হলে গুলিতে নিসাঅং মারমা পায়ে সামান্য আহত হন।

হামলার সময় মগ পার্টির সদস্যরা মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে জানা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যমতে, ঘটনাস্থলের সামান্য

দূরে মগ পার্টির আরো ২০ জন সশস্ত্র সদস্য অবস্থান করছিল। আহত মগ পার্টির সদস্যদের মধ্যে একজন রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাইয়ের চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে, আরেকজন কক্সবাজারের চকরিয়ার মালুমঘাট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

মগ পার্টির উক্ত সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলার পোয়াইতু পাড়ায় তাদের আস্তানা থেকে চাঁদা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে রাজবিলায় গেছে বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, মগ পার্টি হচ্ছে বিগত আওয়ামীলীগ দলের স্থানীয় নেতা ও সেনাবাহিনীর সৃষ্ট এবং মদদপুষ্ট পার্বত্য চুক্তি বিরোধী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী একটি সংগঠন। দীর্ঘদিন ধরে সেনাবাহিনীরই আশ্রয়প্রশ্রয়ে এই মগ পার্টির সদস্যরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে প্রধানত রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী, বাঙ্গালহালিয়া, কাপ্তাই ও বান্দরবানের কিছু কিছু এলাকায় ঘাটি গেঁড়ে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আওয়ামীলীগ সরকারের পতনের পরও রাজস্থলী ও বাঙ্গাহালিয়ায় সেনা ক্যাম্পেরই আশেপাশে মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের আস্তানা ও তৎপরতা বহাল থাকায় এলাকার জনগণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও উদ্বেগ বিরাজ করছে।

লোগাঙে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার

খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের আওতাধীন মাচ্যছড়া নিবাসী হিমেল চাকমা যুবক্কে (৫৫) নামে এক সাধারণ গ্রামবাসী গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাত ৯টার দিকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এই সময় ইউপিডিএফ'র (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের কমান্ডার আইসুখ, নিকোলাস ও কোয়েন এর নেতৃত্বে ঐ গ্রামবাসীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়।

জানা গেছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মাচ্যছড়ার সকল গ্রামবাসীদের ইউপিডিএফ (প্রসিত) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ঘোড়া মার্কায় ভোট দিতে বিভিন্ন ধরনের চাপ ও হুমকি প্রদান করা হয়।

অপহরণের পর অপহৃত হিমেল চাকমা যুবক্কেকে হেদারাছড়ার দিকে নেওয়া হয় বলে খবর পাওয়া গেছে।

এছাড়া অপহরণকারীরা হিমেলের পরিবারকে আরও এই মর্মে শাসিয়ে গেছে যে, ১২ ফেব্রুয়ারিতে ঘোড়া মার্কায় ভোট না দিলে খবর করে দেওয়া হবে।

অপহরণের ১০ দিন পর খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার ১নং লোগাং ইউনিয়নের আওতাধীন মাচ্যছড়া নিবাসী অপহৃত হিমেল চাকমা যুবক্কে অপহরণের বিষয়টি স্বীকার করে ৫ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে অপহরণকারী ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীরা। পরে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃত হিমেল চাকমা যুবক্কেকে ছেড়ে দিয়েছে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীরা।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক ৪ গ্রামবাসীকে অপহরণ

খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ির শীলছড়ি এলাকা থেকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যায় ৬:২০ ঘটিকার সময়ে আবারো তিন গ্রামবাসীকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অপহৃত ব্যক্তিরা হলেন– চাইথোয়াই উ মারমা, উ থোয়াই অং মারমা এবং আরেশে মারমা।

অপরদিকে একই ইউনিয়নের কুতুকছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে সকাল ৯ ঘটিকার সময়ে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক সমীরণ দেওয়ানের সমর্থক দন্তি পাড়ার বাসিন্দা চাইহ্লামং মারমা নামে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয় বলে জানা যায়।

গুইমারায় ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক ২ ত্রিপুরা গ্রামবাসী মারধরের শিকার

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল আনুমানিক ১১ ঘটিকার সময়ে খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি পুংখি পাড়া এলাকার দুই ত্রিপুরা নিরীহ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক মারধরের শিকার হওয়ার অভিযোগ

পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীরা হলেন, ১) ধনেচান ত্রিপুরা (২৫); ২) কুনেন্দ্র ত্রিপুরা (৩৫)।

গ্রামবাসীর সূত্রে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা বিএনপির পক্ষে হয়ে কাজ করার কারণে বাড়ি থেকে নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে জনৈক কালেক্টরের নেতৃত্বে ৩/৪ ইউপিডিএফের সশস্ত্র কর্মী তাদেরকে বেধড়ক মারধর করে।

এই সময় তাদেরকে ১৫ দিনের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে শর্তে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৫০ হাজার টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকিও প্রদান করা হয়।

সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলা ও ভূমি বেদখল

ঘুমধুম ইউনিয়নে রোহিঙ্গা জঙ্গী কর্তৃক ৫ জন তঞ্চঙ্গ্যা শ্রমিককে অপহরণের চেষ্টা

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৫ মঙ্গলবার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড সংলগ্ন গর্জনবনিয়া পাড়ার ৫ জন তঞ্চঙ্গ্যা শ্রমিককে আরসা সশস্ত্র সদস্যরা অপহরণ করে গুম করার চেষ্টা করে। অপহরণ চেষ্টার শিকার তঞ্চঙ্গ্যারা হলেন-

১। জিন্যাউ তঞ্চঙ্গ্যা (৫০), পীং মৃত অংগজাইন তঞ্চঙ্গ্য,
২। অংচিমং তঞ্চঙ্গ্যা (৪৭), পীং চিংলাউ তঞ্চঙ্গ্যা,
৩। মংপুচিং তঞ্চঙ্গ্যা (৫০), পীং অজ্ঞাত,
৪। বারিক্যা তঞ্চঙ্গ্যা (২৫), পীং মংচাচিং তঞ্চঙ্গ্যা, এবং
৫। লামংচা তঞ্চঙ্গ্যা (২২), পীং উচিংলা তঞ্চঙ্গ্যা।

জানা যায় যে, গর্জনবনিয়া পাড়ার হিজল্যা খালের আবদু কলাবাগানের পার্শ্বে আবদু সালামের পান বরজের বাঁশ কাটার জন্য উক্ত তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীরা দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে যান। বিকাল ৪ টার দিকে বাঁশ নিয়ে পানের ক্ষেতে পৌঁছালে জঙ্গলের ঝোপ থেকে হঠাৎ করে ৫ জন আরসা সশস্ত্র সদস্য বের হয়ে পড়ে এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের আটক করে।

৫ জন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীর মধ্য থেকে অল্প বয়সী ২ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আরসা সশস্ত্র সদস্যরা। কিন্তু পান বরজের মালিকের স্ত্রী বলেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে গেলে তাদের উপর দোষ পড়বে ও সমস্যা হবে। পান বরজের মালিকের স্ত্রী অনেক আকুতি মিনতি করলে পরে উক্ত দুইজন যুবকসহ ৫ জন তঞ্চঙ্গ্যাকে ছেড়ে দিয়ে যায় আরসা সদস্যরা।

আরো উল্লেখ্য, ৮ অক্টোবর ২০২৫ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ড সংলগ্ন গর্জন বনিয়া থেকে সুমন তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক জুমচাষীকে এবং গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া থেকে ওয়ামং তঞ্চঙ্গ্যা নামে আরেক গ্রামবাসীকে অপহরণ করে আরএসও ও আরসা জঙ্গীরা। তাদের এখনো হদিস পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত ১৬ মে ২০২৪ তারিখে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং নাফ নদ ৫ নম্বর স্লুইসগেট এলাকা থেকে ছৈলা মং চাকমা (২৯) ও ক্যমংখো তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) নামে দুইজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসীকে রোহিঙ্গা জঙ্গী গোষ্ঠী কর্তৃক অপহরণ করা হয়। তাদেরও এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সেটেলার বাঙালিদের হরতালের কারণে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা বিগত কয়েক দফা স্থগিত হওয়ার পর সর্বশেষ ২১ নভেম্বর ২০২৫ নির্ধারিত হওয়ার কথা থাকলেও সেটেলার বাঙালিদের হরতালের কারণে উক্ত পরীক্ষা ৪র্থ বারের মতো স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ। গত ২০ নভেম্বর পরিষদের চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে উক্ত বার্তাটি এক প্রেস নোটের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়।

উক্ত প্রেস নোটে বলা হয়, পূর্বে নির্ধারিত তারিখকে কেন্দ্র করে ডাকা হরতাল এবং সম্ভাব্য পরিবহন ও নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি বিবেচনায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে পরিষদ পরীক্ষাটি পুনরায় স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

এদিকে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কোটা বৈষম্যের প্রতিবাদে রাঙামাটি জেলায় ২১ নভেম্বর ভোর ৬টা থেকে ৩৬ ঘন্টার হরতাল কর্মসূচি পালন করছে সেটেলার বাঙালিদের কতিপয় উগ্র মুসলিম ধর্মান্ধ বাঙালি সংগঠন।

উক্ত হরতালের প্রথম দিনে সকাল ৬টা থেকে শহরে সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এই সময় সেটেলার বাঙালিদেরকে শহরে বিভিন্ন স্থানে হরতাল পালন করতে দেখা গেছে এবং সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক কয়েকটি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে পরিষদের পক্ষ হতে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিলে সেটেলারদের পক্ষ থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয় বলে জানা যায়।

আরো জানা যায়, ৩৬ ঘন্টা চলমান হরতালে পৃথিবী চাকমা নামে এক নারী পুলিশ সদস্যকে তার কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সেটেলার বাঙালি দ্বারা হেনস্তার শিকার করা হয়। শহরের স্থানীয়দের মতে, উক্ত হরতালে যারা পিকেটিং করছেন তারা সকলে বিভিন্ন পেশাজীবী সেটেলার বাঙালি এবং সেখানে পরীক্ষার্থী নেই বলে দাবি করছেন। এছাড়াও উক্ত হরতালের নাম করে নারীদের বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে বলেও মতামত প্রদান করেন স্থানীয়রা।

অপরদিকে একটি মহল দাবি করেছে, রাঙ্গামাটি শিক্ষক নিয়োগে জেলা বিএনপি, জামাত এবং এনসিপির পক্ষ থেকে ১৫০ টি আসন কোটা হিসেবে দাবি করা হয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত দাবি নাখোশ করায় পরিস্থিতি ঘোলাটে করার উদ্দেশ্যে লোক দেখানো কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু করে এবং উক্ত আন্দোলনে বরাবরই জুম্মদের বিরুদ্ধে সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক উস্কানি প্রদান করা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে সেটেলাররা এক পাহাড়িকে তুলে নিয়ে গেছে

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের রূপাইছড়ি গ্রাম থেকে সেটেলার বাঙালিরা এক পাহাড়িকে তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ৯ নভেম্বর ২০২৫ দুপুর ১২টার সময় খাগড়াবিল গ্রাম থেকে ২০/২৫ জন সেটেলার মোটর সাইকেল ও সিএনজিযোগে রূপাইছড়ি গ্রামে গিয়ে নিজ বাড়ি থেকে নয়ন চাকমা ওরফে দুর্গপদ্ম (৩৫), পিতা- রূপপদ্ম চাকমাকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। তিনি পেশায় একজন দোকানদার। নিজ বাড়ির সামনে চা দোকান দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন।

বান্দরবানে অবৈধ অনুপ্রবেশের সময় ৬ রোহিঙ্গা আটক

বান্দরবান সদর উপজেলায় একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশির সময় ৬ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা কক্সবাজার উখিয়া শরনার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে বান্দরবানে অবৈধ অনুপ্রবেশ করছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়।

গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যায় বান্দরবানগামী পূরবী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তল্লাশির সময় ছয়জন সন্দেহভাজন পুরুষ যাত্রীকে আটক করা হয়। তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেখতে চাইলে তারা নিজেদের বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) হিসেবে পরিচয় দেন। আটকরা হলেন– রহিমুল্লাহ (২৪), হাসিমোল্লা (৩৯), হানিফ (২৫), ইমাম হোসেন (২৭), সৈয়দ আলম (৩২) ও মো. সাগের (২১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটককৃতরা জানান, উখিয়ার বিভিন্ন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে অবৈধভাবে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে বান্দরবানে যাচ্ছিলেন তারা। পরে তাদের সদর থানায় হস্তান্তর করে সেনাবাহিনী।

বান্দরবানে এ ধরনের হাজার হাজার রোহিঙ্গা আছে। কেউ রাবার বাগানে, কেউ রাস্তা নির্মাণ কাজে, কেউ রাজমিস্ত্রীর সহযোগী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গী কর্তৃক তিন বয়স্ক তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে হয়রানি

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ মিয়ানমারের রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গ্যা স্যালভাশন আর্মী (আরসা) কর্তৃক বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের রেজু মৌজার গর্জনবনিয়া পাড়ার তিনজন বয়স্ক তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে দড়ি বেঁধে ৬ ঘন্টা ধরে আটকে রেখে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আটকের শিকার তঞ্চঙ্গ্যা নারীরা হলেন– অংক্রাচিং তঞ্চঙ্গ্যা (৬০), স্বামী কানু তঞ্চঙ্গ্যা; মালাপু তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), স্বামী বেংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা এবং মালাইছে তঞ্চঙ্গ্যা (৪২), স্বামী পুলাঅং তঞ্চঙ্গ্যা।

খাগড়াছড়িতে সেটেলার কর্তৃক জুম্মদের ওপর হামলা, ৩ জন গুরুতর আহত ও একজন মৃত্যুবরণ

গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৪ ঘটিকার সময়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়ার অন্তর্ভুক্ত খালপাড় নামক স্থানে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৩ জন জুম্মকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়। তিনজন ভুক্তভোগী হলেন– ১) থৈহ্লাঅং চৌধুরী (৬৮), পিতা: ক্যজই চৌধুরী, ঠিকানা: হেডম্যান পাড়া; ২) বিমল ত্রিপুরা (৩৭), পিতা: মনোরম ত্রিপুরা, ঠিকানা: নতুন পাড়া এবং ৩) মিলন চাকমা (৩৯), পিতা: কিনারাম চাকমা, ঠিকানা: নোয়াওয়াড়া।

উক্ত তিনজনের মধ্যে বিমল ত্রিপুরাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হলে তাকে খাগড়াছড়ি হাসপাতাল হতে চট্টগ্রামের এশিয়ান স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড হাসপাতালে নেয়া হয়। এরপর ১৫ জানুয়ারি বিকাল ৩ ঘটিকার সময়ে বিমল ত্রিপুরাকে এশিয়ান স্পেশালাইজড হসপিটাল লিমিটেড হতে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসকদের মতে তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। অপর দুইজনকে খাগড়াছড়ি সদর হসপাতালে ভর্তি করা হয় বলে জানা যায়।

সূত্র মোতাবেক, দীর্ঘদিন ধরে সেটেলার বাঙালি আব্দুল বশি, পিতাঃ তাজির উদ্দিন, ঠিকানাঃ ভুয়াছড়ি (জোরপূর্বক বসতি স্থাপন)'র সাথে থৈহ্লাঅং চৌধুরীর একটি জায়গার বিরোধ চলমান ছিল। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে থৈহ্লাঅং চৌধুরী উক্ত জায়গায় আমবাগান করে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেটেলার বাঙালি আব্দুল বশি জায়গাটি তার বলে অবৈধভাবে দাবি করতে থাকে। এক পর্যায়ে আদালতে মামলা করা হলে আদালতের নির্দেশে ভূমি অফিস থেকে জায়গাটি তদন্তের জন্য আসলে সেটেলার বাঙালিদের বাধাদানের কারণে তা করা সম্ভবপর হয়নি।

পরবর্তীতে থৈহ্লাঅং চৌধুরী দুইজন শ্রমিক অর্থাৎ বিমল ত্রিপুরা ও মিলন চাকমাকে নিয়ে ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তার আমবাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে গেলে বিকাল ৪ ঘটিকার সময়ে আব্দুল বশি, তার দুই ছেলে রশিদ ও নাসিরসহ আরো কয়েকজন সেটেলার বাঙালিকে নিয়ে তাদের বাগান পরিষ্কার করতে বাধা প্রদান করে। এতে সেখানে সেটেলার বাঙালিদের সাথে থৈহ্লাঅং চৌধুরীর বাকবিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সেটেলাররা তাদের উপর উপর্যুপরি দেশিয় ধারালো দা দিয়ে হামলা চালায়। এতে বিমল ত্রিপুরাকে মাথায় গুরুতরভাবে আঘাত করা হয়।

পরে আশেপাশে গ্রামে বিষয়টি জানাজানি হলে উক্ত গ্রামের জুম্মরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এতে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের আসার খবর পেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে গ্রামবাসীরা উক্ত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অপরদিকে ঘটনার ৯ দিন পর গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ রোজ বুধবার খাগড়াছড়ি সদরের কমলছড়ি ইউনিয়নের হেডম্যান

পাড়ার অন্তর্ভুক্ত খালপাড় নামক স্থানে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত বিমল ত্রিপুরা (৩৭) পিতা: মৃত মনোরাম ত্রিপুরা, মাতা: মৃত কুমারী ত্রিপুরা, গ্রাম: নুয়াপাড়া, ২৬২ নং ভুয়াছড়ি, খাগড়াছড়ি সদর সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা যায়।

এই ঘটনায় উভয় পক্ষ থেকেই পৃথক মামলা করা হয়। জুম্মদের পক্ষ থেকে মংশিতু মারমা বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। অপরদিকে সেটেলার বাঙালিদের পক্ষে মোছাঃ খাদিজা পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে আরেকটি মামলা করেন।

তবে খাদিজার মামলার এজাহারভুক্ত আসামিরা আদালতে আত্মসমর্পণ করে এর মধ্যে জামিন নিয়েছেন বলেও জানা যায়।

আরো জানা যায়, এরই মধ্যে পুলিশ মোঃ আব্দুর রশিদ ও মো. আল আমিন নামে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে আব্দুর রশীদকে চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও আল আমিনকে গত ২২ জানুয়ারি কুমিল্লার কান্দিরপাড় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলিকদমে রোহিঙ্গা ও সেটেলার সন্ত্রাসী কর্তৃক ম্রোদের উপর হামলা, আহত অন্তত ১৭ জন

গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার ৩ নং নয়াপাড়া ইউনিয়ন ও ৯ নং ওয়ার্ড জানালী পাড়াস্থ স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের যোগসাজশে জানালী পাড়ার ম্রো আদিবাসীদের উপর দুই দফা হামলায় অন্তত ১৪ জন আহত ও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা যায়।

আহত ব্যক্তিরা হলেন– ১) লংসান ম্রো (৩০) পিতা-পাচ্ছ ম্রো কার্বারি; ২) অংসং ম্রো (৩০), পিতা: কটঙং ম্রো; ৩) কটঙং ম্রো (৫০), পিতা: কাই ইন ম্রো; ৪) লাংচিং ম্রো; ৫)কাইনপা ম্রো; ৬) ঙানওয়াই ম্রো (২৭), পিতা: দন রুই ম্রো; ৭) মেনরু ম্রো মেনরু ম্রো (৪০), পিতা: খাইন দই ম্রো; ৮) থংইয়া ম্রো; ৯) চিংইয়ক ম্রো; ১০) বাংতাক ম্রো; ১১) কাংওয়াই ম্রো; ১২) শানতই ম্রো; ১৩) ধংরই ম্রো; ১৪) লাংছিং ম্রো (৩০), পিতা: মপম ম্রো।

গুরুতর আহতরা হলেন: ১) অমর ত্রিপুরা (৫০), পিতা: নয়া চন্দ্র ত্রিপুরা; ২) ডাংয়া ম্রো (৫২), পিতা: মেনসা ম্রো; ৩) প্রেকিক্য ম্রো (২৬), পিতা: মাংইন ম্রো।

গ্রামবাসীদের তথ্য মতে, অভিযুক্ত জাফর আলম (৪৫) পিতা-ফরিদুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ড ও ৩ নং নয়াপাড়া ইউনিয়নের বাসিন্দা বলে জানা যায়। জাফর আলম একজন রোহিঙ্গা শরণার্থী। তার বিরুদ্ধে আলিকদম থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে এবং মামলায় জেলও খেটেছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে প্রশাসনের লোক ধরে সে দেশের নাগরিকত্ব ও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ম্রো পাড়ার লোকজনের সৃজিত কলা বাগান থেকে কলা চুরি, গরু, ছাগল সহ বাগানের বিভিন্ন

ফসলাদি ও খামারের হাসঁমুরগী সে চুরি করে আসছিল। পরবর্তীতে গত ১৭ জানুয়ারি আনুমানিক সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময়ে জানালী পাড়ার লংসান ম্রো (৩০) পিতা- পাচ্ছ ম্রো কারবারী কলা বাগান থেকে ৪টি কলার ছড়ি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় তাকে এলাকার লোকজন হাতেনাতে ধরে ফেলে বেঁধে রাখে।

পরে ঘটনার বিষয়ে ৩ নং নয়াপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফোগ্য মার্মাকে অবহিত করা হলে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে চোরাইকৃত কলা ছড়ি সহ আসামী জাফর আলমকে পাড়ায় রাখতে নির্দেশ প্রদান করে। পরে চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পূর্বে সকাল ১০ ঘটিকার সময়ে তার ছেলে মফিজ উদ্দিন (২৫), জিয়া উদ্দিন (২১) সহ ১০/১২ জন রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের নিয়ে লংসান ম্রো'র বাড়িতে হামলা করে।

এই সময় তাদের বাধা প্রদান করতে গেলে প্রেকিক্য ম্রো (২৬), অংসং ম্রো (৩০) উভয়কে বেধড়ক মারধর করে বাম চোখের উপরিভাগে, মুখে, বুকে, পিঠে জখম করে। একপর্যায়ে রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিরা সন্ত্রাসী কায়দায় জাফর আলমকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং প্রেকিক্য ম্রো ও অংচং ম্রোকে আহত অবস্থায় গ্রামবাসীরা আলিকদম সরকারি হাসপাতালের নিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর লংসান ম্রো ও গ্রামবাসীদেরকে রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করা হয়। পরে জানালী পাড়ার ম্রো আদিবাসীরা নিজেদের নিরাপত্তা আশংকা ভেবে স্থানীয় চেয়ারম্যান সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করে আলিকদম থানায় একটি মামলা দায়ের করে। পরে সকাল ১১ ঘটিকার সময়ে গ্রামবাসীদের আলিকদম থানায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিলে তারা গ্রামে ফিরে যান।

পরবর্তীতে বিকাল আনুমানিক ৫ ঘটিকার সময়ে আলিকদম থানার পক্ষ থেকে মুঠোফোনে গ্রামবাসীদের থানায় যেতে বলা হয়। গ্রামবাসীরা সেখানে উপস্থিত হলে ওসি জানান, তাদের ভুল নম্বরে কল করা হয়েছে। পরে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময়ে গ্রামবাসীরা দুইটি টমটমে করে থানা হতে গ্রামে ফেরার পথে নয়া পাড়া কবরস্থান সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে ২৫/৩০ জনের অধিক সেটেলার বাঙালি ও রোহিঙ্গা শরণার্থী কর্তৃক ধারালো দা, লোহার রড, ছুড়ি ও লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তা গতিরোধ করে তাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত হামলা করে। এতে টমটম গাড়িতে থাকা ১৮ জনের মধ্যে ৮ জন গুরুতর আহত হন।

পরে লংসান ম্রো, অমর ত্রিপুরা, ডাইয়া ম্রো, প্রেকিক্য ম্রো, অংসং ম্রো, কটঙং ম্রো, লাংচিং ম্রো, কাইনপা ম্রো, ঙানওয়াই ম্রো, মেনরু ম্রো, থংইয়া ম্রো, চিংইয়ক ম্রো, বাংতাক ম্রো, কাংওয়াই ম্রো, শানতই ম্রো, ধরেই ম্রো সহ সকলকে আহত অবস্থায় আলিকদম সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাংইয়া ম্রো ও অমর ত্রিপুরা, প্রেকিক্য ম্রো'র অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

সেটেলার বাঙালি ও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা ম্রো আদিবাসীদের কাছ থেকে ৪টি মোবাইল, ডাংইয়া ম্রো থেকে ২০,০০০ টাকা, অমর ত্রিপুরা থেকে ৮,০০০ টাকা, কটনং ম্রো থেকে ৭০০০ টাকা জোরপূর্বক নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

এই সময় লংসান ম্রো বাদী হয়ে ১০ জনের নাম ও ৭/৮ জন অজ্ঞাতনামা উল্লেখ করে আলিকদম থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

অভিযুক্তরা হলো: ১। জাফর আলম (৪৫) পিতা- ফরিদুল ইসলাম, ২। মফিজ উদ্দিন (২৫), ৩। জিয়া উদ্দিন (২১), উভয়ের পিতা- জাফর আলম, ৪। আলী মদন (৪০), পিতা-অজ্ঞাত, ৫। রিয়াজ উদ্দিন (৩৮), পিতা-মৌলভী আবু তৈয়ব, ৬। মোঃ জহির (২০), ৭। মোঃ মুবিন (২২), উভয়ের পিতা-মোঃ সিরাজ, সর্বসাং- দক্ষিণ নয়াপাড়া, ০৬ নং ওয়ার্ড, ৮। মোঃ ইস্কান্দার (৩৮), ৯। রেজাউল করিম (৩২), উভয়ের পিতা-ফরিদুল আলম, ১০। রহিমা খাতুন (৩০), স্বামী-ইস্কান্দার।

আলিকদম থানা থেকে আবারও ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ গ্রামবাসীদের থানায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। গ্রামবাসীরা যেতে অনীহা প্রকাশ করলে থানার ওসি মামলার কাগজ সংশোধনের কারণ জানান।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক তিন তঞ্চঙ্গ্যাকে মারধর

বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৩ নং ঘুমধুম ইউনিয়নে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী মারধরের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক এবং অপর দুজনের মধ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষ বলে জানা যায়।

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ চিয়ন্যা তঞ্চঙ্গ্যা, পিতা: কালিচরণ তঞ্চঙ্গ্যা, মাতা: মাউককেং তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম: জামিরতলী, ইউনিয়ন: ঘুমধুম, ৯নং ওয়ার্ড, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিচয়ের এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নানা অজুহাতে মারধর ও হুমকি দেওয়া হয়।

পরিবারের সূত্রে জানা যায়, চিয়ন্যা তঞ্চঙ্গ্যা জন্মের পর থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন। গত ২৪ জানুয়ারি টেকনাফের হরিখোলা বৌদ্ধ বিহারে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে তিনি গাড়িতে না গিয়ে হেঁটে রওনা দেন।

এই সময়, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলে পথে কিছু রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে। পরে তাকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে মারধর ও নানাভাবে হুমকি প্রদান করে।

অন্যদিকে গত ২২ জানুয়ারি ২০২৬ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৩নং ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময়ে বাগানে ফুলঝাড়ু কাটার সময় বর্ণমালা তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক নারী ও কালু তঞ্চঙ্গ্যা নামে এক যুবককে অস্ত্রধারী তিনজন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী (আরসা) কর্তৃক আটক করে মারধর করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, সকালে ফাত্রাঝিড়ি গ্রাম থেকে প্রায় ৩-৪ কিলোমিটার দূরে বাগানে ঝাড়ু কাটতে যান তারা। এ সময়

হঠাৎ করে অস্ত্রধারী তিনজন রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী (আরসা) তাদের আটক করে একটি পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে দুজনকেই নির্মমভাবে মারধর করা হয়। এক পর্যায়ে বর্নমালা তঞ্চঙ্গ্যাকে মারধরের পর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলেও কালু তঞ্চঙ্গ্যাকে প্রায় তিন ঘন্টা সেখানে আটকে রাখা হয় এবং তাকে সেখানে মারধর করা হয়।

পরে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা তাদের জানিয়ে দেয়, তারা (পাহাড়িরা) যেন পাহাড়ি এলাকায় আর প্রবেশ না করে সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা সেটেলার কর্তৃক একজন জুম্মকে মারধর

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৬ রাত আনুমানিক ৭:৩০ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ৩নং ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের পাত্রাঝিড়ি এলাকায় "নুরু গ্রুপ" নামে রোহিঙ্গা ডাকাতদল কর্তৃক উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা (২৬), পিতা: সুমোহন তঞ্চঙ্গ্যা, মাতা: ক্যএচিং তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ করে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র মোতাবেক, সেদিন সন্ধ্যার দিকে উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা ও তার দুই বাঙালি বন্ধু মিলে পাত্রাঝিড়ির একটি ইটের ভাটার পাশে গল্প করছিলেন। উক্ত স্থানে হঠাৎ টমটম যোগে একদল রোহিঙ্গা ডাকাত (স্থানীয় ভাষায় যাদেরকে 'নুরু গ্রুপ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়) এসে উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যাকে জোরপূর্বক পাশের একটি পাহাড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। পরে উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা'র দুই বাঙালি বন্ধু রোহিঙ্গা ডাকাতদের অনুরোধ করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, ড. মুহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং ডাকাত চক্রের সন্ত্রাসী কার্যক্রম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা ক্রমে সেখানকার জুম্মদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বর্তমানে সেখানকার জুম্মরা অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জীবনের নিরাপত্তা শঙ্কায় দিনাতিপাত করছেন বলে জানা গেছে।

আলিকদমে হামলার শিকার জুম্মদের বিরুদ্ধে উল্টো মিথ্যা মামলা দায়ের

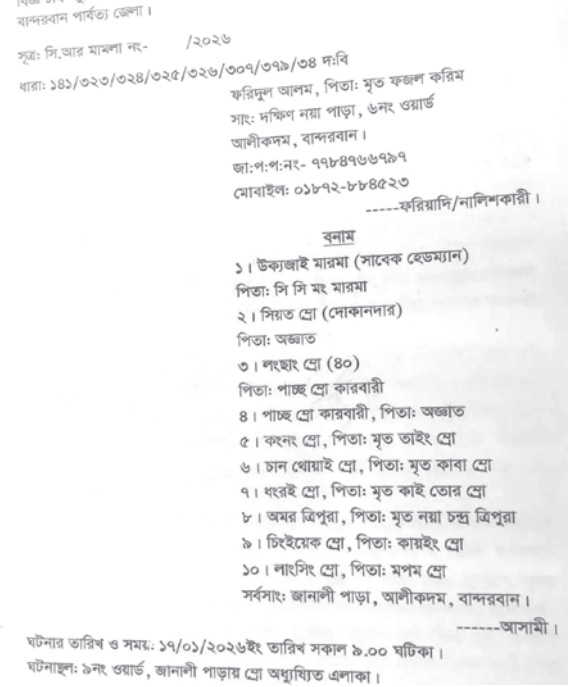

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (আমলী আদালত-১)
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

সূত্র: সি.আর মামলা নং- /২০২৬
ধারা: ১৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৩৪ দ:বি
ফরিদুল আলম, পিতা: মৃত ফজল করিম
সাং: দক্ষিণ নয়া পাড়া, ৬নং ওয়ার্ড
আলীকদম, বান্দরবান।
জা:প:প:নং- ৭৭৮৪৭৬৬৭৯৭
মোবাইল: ০১৮৭২-৮৮৪৫২৩
-----ফরিয়াদি/নালিশকারী।

বনাম
১। উক্যজাই মারমা (সাবেক হেডম্যান)
পিতা: সি সি মং মারমা
২। সিয়ত ম্রো (দোকানদার)
পিতা: অজ্ঞাত
৩। লংছাং ম্রো (৪০)
পিতা: পাচ্ছ ম্রো কারবারী
৪। পাচ্ছ ম্রো কারবারী, পিতা: অজ্ঞাত
৫। কংনং ম্রো, পিতা: মৃত তাইং ম্রো
৬। চান থোয়াই ম্রো, পিতা: মৃত কাবা ম্রো
৭। ধংরই ম্রো, পিতা: মৃত কাই তোর ম্রো
৮। অমর ত্রিপুরা, পিতা: মৃত নয়া চন্দ্র ত্রিপুরা
৯। চিংইয়েক ম্রো, পিতা: কায়ইং ম্রো
১০। লাংসিং ম্রো, পিতা: মপম ম্রো
সর্বসাং: জানালী পাড়া, আলীকদম, বান্দরবান।
------আসামী।

ঘটনার তারিখ ও সময়: ১৭/০১/২০২৬ইং তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকা।
ঘটনাস্থল: ৯নং ওয়ার্ড, জানালী পাড়ায় ম্রো অধ্যুষিত এলাকা।

সম্প্রতি বান্দরবান জেলার আলিকদম উপজেলার নয়াপাড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের জানালী পাড়ার জুম্ম গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক হামলার শিকার হন এবং অন্তত ১৭ জন আহত হন।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ উল্টো সেই হামলাকারী রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক হামলার শিকার জুম্মদের মধ্যে ১০ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবানের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যার চেষ্টা, জীবন নাশের হুমকি সহ নানা মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। মামলার বাদী ফরিদুল আলম, পিতা: মৃত ফজল করিম, ঠিকানা: দক্ষিণ নয়াপাড়া, ৬নং ওয়ার্ড, আলিকদম। জুম্মদেরকে হামলায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকেও মামলায় সাক্ষী রাখা হয়েছে।

উক্ত মামলায় যেসব নিরীহ জুম্মদেরকে আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা হলেন: ১। উক্যজাই মারমা

(সাবেক হেডম্যান), পিতা: সি সি মং মারমা, ২। সিয়ত ম্রো (দোকানদার), পিতা: অজ্ঞাত, ৩। লংছাং ম্রো (৪০), পিতা: পাচ্ছ ম্রো কার্বারি, ৪। পাচ্ছ ম্রো কার্বারি, পিতা: অজ্ঞাত, ৫। কংনং ম্রো, পিতা; মৃত তাইং ম্রো, ৬। চানথোয়াই ম্রো, পিতা: মৃত কাবা ম্রো, ৭। ধংরই ম্রো, পিতা: মৃত কাই তোর ম্রো, ৮। অমর ত্রিপুরা, পিতা: মৃত নয়া চন্দ্র ত্রিপুরা, ৯। চিং ইয়েক ম্রো, পিতা: কাইইং ম্রো, ১০। লাংসিং ম্রো, পিতা: মপম ম্রো। তারা সকলেই জানালী পাড়ার বাসিন্দা।

মামলায় অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণভাবে জুম্মদেরকে 'পাহাড়ি ম্রো সম্প্রদায়ের অসভ্য ও সন্ত্রাসী শ্রেণির লোক' বলে উল্লেখ করা হয়। মামলায় জুম্মদের বিরুদ্ধে 'দা ও বাঁশের লাঠি দিয়ে বাদীর (অভিযোগকারী) ছেলেকে আক্রমণ করা, জাফর আলমকে হত্যার চেষ্টা সহ নানা মিথ্যা, সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ আনা হয় বলে ভুক্তভোগী জুম্মরা জানান।

উল্লেখ্য, গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ আলিকদম উপজেলার ৩ নং নয়াপাড়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড এর জানালী পাড়াস্থ স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জানালী পাড়ার ম্রো ও ত্রিপুরা আদিবাসীদের উপর দুই দফা হামলায় অন্তত ১৪ জন আহত ও ৩ জন গুরুতর আহত হন।

লামায় সাবেক বাঙালি আওয়ামীলীগ নেতা কর্তৃক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শ্মশান ও বসতভিটা দখলের চেষ্টা

বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার লামা সদর ইউনিয়নের মিরিঞ্জা বাগান পাড়ায় সাবেক মেয়র ও আওয়ামীলীগ নেতা মো. জহিরুল ইসলাম কর্তৃক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শ্মশান ও বসতভিটা জবরদখল করে রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র মতে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ লামা উপজেলার মিরিঞ্জা বাগান পাড়ায় ৬০ ত্রিপুরা পরিবারের ব্যবহৃত শ্মশান ও বসতভিটার জায়গা দখলের চেষ্টা চালানো হয়। মো. জহিরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত লোক সেখানে এসে জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে। পরে স্থানীয় জুম্মরা জানতে পেরে সেখানে গিয়ে বেদখলের চেষ্টাকারীদের থামানোর চেষ্টা করে। এতে জুম্ম এলাকাবাসী ও দখলদারদের মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়।

অভিযুক্ত জহিরুল ইসলামের পিতা নাম নুরুল ইসলাম (পেস্কার), তিনি মূলত নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার একজন স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৮৩ সালের দিকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদেরকে সেটেলার হিসেবে ওই এলাকায় নিয়ে আসা হয়।

জানা যায়, ২০১১ সালের দিকে মিরিঞ্জা বাগান পাড়ায় ৩ ভাই হালিরাম ত্রিপুরা, মালিরাম ত্রিপুরা ও পুণরাম ত্রিপুরা মিলে সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা মো: জহিরুল ইসলামের নিকট ২ একর জমি প্রতি একরে ১১ হাজার টাকা করে বিক্রয় করে। পরে ২০১৩ সালে জহিরুল ইসলাম প্রায় ২ একর জায়গায় অতিরিক্ত ৩০০ একরের মতো জায়গা দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে আবারো সাবেক মেয়র জহিরুল ইসলাম নিজের নামে দখল করা ৩০০ একর জায়গাটি অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোস্তফা জামানের কাছে প্রতি একর ১ লক্ষ টাকা করে জায়গাটি বিক্রয় করেন।

পরবর্তীতে নিরঞ্জয় ত্রিপুরা, রায়চন্দ্র ত্রিপুরা, অনিক ত্রিপুরা, বীর বাহাদুর ত্রিপুরা এই চারজনের বিরুদ্ধে দখলদার অবসরপ্রাপ্ত মেজর মোস্তফা জামান মামলা দায়ের করেন।

বর্তমানে উক্ত এলাকায় দখলদারদের কর্তৃক রিসোর্ট নির্মাণের জন্য নানাভাবে ভূমি বেদখলের পায়ঁতারা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে দরিদ্র জুম্ম গ্রামবাসীরা অসহায় বোধ করছেন বলে জানা গেছে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

নাইক্ষ্যংছড়িতে রোহিঙ্গা জঙ্গী কর্তৃক তঞ্চঙ্গ্যা নারী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার

বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ১৬৮নং রেজু মৌজাধীন ঘুমধুম ইউনিয়ন ও সোনাইছড়ি ইউনিয়নের মধ্যবর্তী হাতিমারা পাড়া নামে এক গ্রামে এক তঞ্চঙ্গ্যা নারী রোহিঙ্গা জঙ্গীদের কর্তৃক ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ১২ নভেম্বর ২০২৫ সন্ধ্যা আনুমানিক ৫:৩০ টার দিকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সশস্ত্র সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও)-এর সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এই ধর্ষণের চেষ্টা ঘটেছে বলে জানা গেছে। ওই নারীর স্বামী হাতিমারা পাড়ার মৃত লংবু অং তঞ্চঙ্গ্যা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঐদিন বিকেলে ওই ভুক্তভোগী নারী তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বাজার থেকে বিভিন্ন সামগ্রী কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জামিরতলী খাল পেরিয়ে পাহাড়ের রাস্তা হাঁটার পথে হঠাৎ আরএসও-এর ১০-১৫ জনের একদল সদস্য তাকে আটকায় এবং হুমকি-ধমকি দিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করতে থাকে।

এমন সময় ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়া ৮-১০ জন জুম্ম যুবক ঐ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ওই তঞ্চঙ্গ্যা নারী সম্ভাব্য ধর্ষণ থেকে রক্ষা পায়। জুম্ম যুবকরা ওই নারীকে আটকিয়ে রাখা লোকদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা আরএসও-এর সদস্য এবং তারা ৩৪ বিজিবি কমান্ডারের নির্দেশে সেখানে অবস্থান করছেন বলে জানায়।

এরপর জুম্ম যুবকরা ওই তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সাথে সাথে জুম্ম যুবকরা ঘুমধুমের ৯নং ওয়ার্ডের চৌকিদার রূপন বড়ুয়াকে ওই নারীর বিষয়টি জানালে, চৌকিদার রূপন বড়ুয়া ওই আরএসও-এর সদস্যরা তার লোক এবং তাদের বিষয়ে বেশি কিছু না বলে চুপ করে থাকার পরামর্শ দেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে আরসা কর্তৃক তিন বয়স্ক তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে আটক করে হয়রানি

মিয়ানমারের রোহিঙ্গ্যা জঙ্গী সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গ্যা স্যালভাশন আর্মী (আরসা) কর্তৃক বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের রেজু মৌজার গর্জনবনিয়া পাড়ার তিনজন বয়স্ক তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে দড়ি বেঁধে ৬ ঘন্টা ধরে আটকে রেখে হয়রানি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আটকের শিকার তঞ্চঙ্গ্যা নারীরা হলেন–

১। অংক্রাচিং তঞ্চঙ্গ্যা (৬০), স্বামী কানু তঞ্চঙ্গ্যা,

২। মালাপু তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫), স্বামী বেংগ্যা তঞ্চঙ্গ্যা এবং

৩। মালাইছে তঞ্চঙ্গ্যা (৪২), স্বামী পুলাঅং তঞ্চঙ্গ্যা।

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ১০:০০ টার দিকে গর্জনবনিয়া পাড়া থেকে উক্ত তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা নারী গর্জনবনিয়া পাড়া থেকে ২০০ গজ পূর্বে খালে স্নান করতে গেলে আরসা সশস্ত্র সদস্যরা তাদেরকে ধরে নিয়ে সারাদিন আটকিয়ে রাখে।

তিনজনের মধ্যে মালাইছ তঞ্চঙ্গ্যাকে মারধর করা হয়েছে। তাদেরকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় অংক্রাচিংকে চোখে কালো কাপড় বেঁধে দেয়। অন্য দুইজনকে হাত পেছনে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় বলে জানা যায়। হয়রানি ও নির্যাতনের পর বিকালের দিকে উক্ত তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা নারীকে ছেড়ে দেয় আরসা সন্ত্রাসীরা।

বান্দরবানের এক আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ ও জোরপূর্বক দেহব্যবসা করানোর অভিযোগ

অভিযুক্ত: মো. রুবেল হোসেন ও নুমেউ মারমা

গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ বান্দরবান সদর উপজেলার এক আদিবাসী মারমা তরুণীকে মং মারমা নামে এক যুবক কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে মোঃ রুবেল হোসেন (২৮) ও তার স্ত্রী নুমেউ মারমার (২৫) হাতে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়ে ভয়াবহ প্রতারণা, এক মাস ধরে গণধর্ষণ ও জোরপূর্বক দেহব্যবসা করানোর অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, এক মাস আগে অভিযুক্ত প্রতিবেশী মং মারমা, রুবেল হোসেন ও নুমেউ মারমা তার বাড়িতে আসে। যদিও নুমেউ মারমা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সুকৌশলে ভুক্তভোগী তরুণীকে কক্সবাজারে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে বান্দরবান থেকে কক্সবাজার চৌফলদন্ডী স্থানে আসার পর তাকে চেতনা নাশক

ঔষুধ খাইয়ে ৭-৮ জন বাঙালির ছেলের মাধ্যমে গণধর্ষণ করানো হয়।

এরপর তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেখিয়ে জিম্মি করে পূর্ব পাহাড়তলীর ইছুলের ঘোনা এলাকার মান্নাত ম্যানশন নামে একটি ভবনে ৫ম তলার ফ্লাটে আটকে রাখা হয়।

ভুক্তভোগী আরো জানান, তাকে এক মাসের অধিক আটকে রেখে প্রতিদিন নিয়ে যাওয়া হয় পতিতাবৃত্তিতে। শুধু তাই নয়, জোরপূর্বক কক্সবাজারের বিভিন্ন হোটেল কটেজে পতিতাবৃত্তি করানো হয় এবং বাকি সময় অবরুদ্ধ করে রাখা হয় ফ্লাটে। এমনকি যে ফ্লাটে রাখা হয়েছে, সেখানেও ঘুমন্ত অবস্থায় রুবেল তার বন্ধুদের নিয়ে এসে তরুণীর সাথে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করার জন্য বাধ্য করানো হয়।

রুবেলও তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাধিকবার ধর্ষণ করে এবং ইয়াবা, ঘুমের ঔষধ সেবনের জন্য রুবেল হোসেন ও তার স্ত্রী নুমেউ মারমা প্রতিনিয়ত বাধ্য করে। পরে তিনি অস্বীকৃতি জানালে তাকে মারধরও করা হয়।

এরপর রবিবার (৪ জানুয়ারি) রাত ৮ ঘটিকার সময়ে কোনরকম ছাড়া পেয়ে ফ্লাট থেকে নেমে পাহাড়তলির একটি চায়ের দোকান এসে আশ্রয় নেন। পরে এলাকাবাসী জরুরি সেবা ৯৯৯ কল দিলে ঐ তরুণীকে পুলিশ উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত রুবেল হোসেন ও নুমেউ মারমাকে আটক করে।

জানা যায়, মোঃ রুবেল হোসেনের বাড়ি কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের মাইজপাড়া গ্রামে মোহাম্মদ হোসেনের পুত্র। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক ও ছিনতাইয়ের মামলা রয়েছে। এক বছর আগে নুমেউ মারমা ধর্মান্তরিত হয়ে রুবেল হোসেনকে বিয়ে করে।

স্থানীয় সূত্র মোতাবেক, তারা পাহাড়ি মেয়েদের অর্থের প্রলোভন ও বিভিন্ন সুকৌশলে তাদের ফাঁদে ফেলে কক্সবাজারে নিয়ে আসার মাধ্যমে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার একটি চক্র গড়ে তুলেন।

পালংখালীতে এক চাকমা কিশোরীকে অপহরণ ও ভুক্তভোগী পরিবারকে হুমকি-ধামকি

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন পালংখালী ইউনিয়নে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাত ৩:৩০ ঘটিকার সময়ে ইউপি সদস্য কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ৬-৭ জনের একটি দল লক্ষ্মীমায়া চাকমা (১৭) নামে এক আদিবাসী চাকমা কিশোরী অপহরণের শিকার হয় বলে জানা যায়।

অপহরণকারীর পরিচয়- কামাল উদ্দিন (৩৬), পিতা: মোঃ কালিমউল্লাহ বলি, মাতা: মৃত মালেকা বেগম, স্ত্রী: তৈয়বা

আটক: আব্দুল্লাহ বাপ্পি

বেগম, সাং- উত্তর রহমতের বিল, ৩ নং ওয়ার্ড, ৫ নং পালংখালী ইউপি, গ্রাম: থাইংখালী, থানা: উখিয়া, কক্সবাজার।

ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্র মোতাবেক, এক মাস হয়ে গেলেও এখনো উদ্ধার হয়নি উক্ত কিশোরী। উল্টো ঘটনার বিচার চাইতে গেলে ভুক্তভোগী পরিবারকে হাত-পা কেটে দেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

এই সময় ভুক্তভোগীর পিতা জানান, ঘটনার বিচার চাইতে গেলে থানায় পুলিশের সামনে কামাল মেম্বার আমাদেরকে হাত কেটে দিবো, পা কেটে দিবো ও আমাদের চাকমাদের গালি গালাজ এবং আমাকে কি করতে পারেন করেন বলেও হুঁশিয়ারি প্রদান করেন। আমার সাথে কি শত্রুতা আছে আমি জানিনা। আমি তার কোনো ক্ষতি করিনি। আমার মেয়েকে কি কারণে সে অপহরণ করেছে জানিনা।

ভুক্তভোগীর বড় ভাই বলেন, ইউপি সদস্য কামালের নেতৃত্বে ৫-৬ জন আমার বোনকে অপহরণ করেছে। এরপর আমরা থানায় একটি জিডি করি। তারপর থেকে আমাদেরকে পা কেটে দেবো, হাত কেটে দেবো বলে নানা জীবন নাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমার বোনকে এক মাস হয়ে গেছে অপহরণ করে নিয়ে গেছে কিন্তু এখনো জানতে পারছিনা কোথায় নিয়ে গেছে, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। প্রশাসনের কাছে আমরা বিচার চাই যেন আমার বোনকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করা হোক।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে, উক্ত কামাল উদ্দিন এক সময় মাদক কারবারি করতো। তার নামে রয়েছে অর্ধশতাধিক মাদক কারবারির মামলা। বর্তমানে মাদক কারবারি থেকে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন।

সাজেকে বাঙালি মিস্ত্রি কর্তৃক একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোর ধর্ষণের শিকার

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির সাজেকে একজন বহিরাগত বাঙালি মিস্ত্রি কর্তৃক স্থানীয় একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোর (১৫) ধর্ষণের শিকার হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাত আনুমানিক ১০:০০ ঘটিকা সময়ে, ৩৬নং সাজেক ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের উজোবাজার এলাকায়।

ধর্ষণকারী বাঙালি মিস্ত্রির নাম: সুবল কান্তি বড়ুয়া; পিতা: যতিন বড়ুয়া; গ্রাম: বিন্দুপাড়া, বোয়ালখালী ইউনিয়ন, দীঘিনালা উপজেলা, খাগড়াছড়ি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সুবল কান্তি বড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩৬নং সাজেক ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের উজোবাজার এলাকায় কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাত আনুমানিক ১০:০০ ঘটিকায় সময়ে ভুক্তভোগী কিশোরকে তিনি প্রথমে মদ খাইয়ে পুরোদস্তুর মাতাল করেন। পরে মাতাল অবস্থায় তাকে ধর্ষণ করে সেখান থেকে পালিয়ে যান।

ঘটনার দুইদিন পর জানাজানি হলে উজোবাজারের স্থানীয়রা ধর্ষণকারী সুবল কান্তি বড়ুয়ার উপর চরমভাবে ক্ষিপ্ত হন। এবং স্থানীয় যুবসমাজের সহায়তায় তাকে আটক করা হয়।

পরে সামাজিকভাবে উভয়পক্ষের জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শারীরিক শাস্তি হিসেবে তাকে ১০ বেত ও দশ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা দিয়ে বিচারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগেও সুবল কান্তি বড়ুয়ার বিরুদ্ধে একাধিক জুম্ম নারীকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি বার বার অপরাধ করেও পার পেয়ে গেছেন বলে স্থানীয় অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

সংগঠন সংবাদ

ঢাকায় পিসিপি মিরপুর শাখার ৬ষ্ঠ কাউন্সিল সম্পন্ন

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৪ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকা মিরপুরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মিরপুর থানা শাখার ৬ষ্ঠ সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জগদীশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য মেরিন চাকমাসহ ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

পিসিপির ঢাকা মিরপুর শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি অভি চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ভরত চাকমার সঞ্চালনায় সম্মেলন ও কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শাখা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজিত চাকমা।

অন্তর চাকমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ হলো আমাদের অধিকার আদায়ের লড়াইকে বেগবান করার পাঠশালা। আপনারা যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেন, যুগে যুগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা লড়াই করেছেন। সেসব থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে আমাদের লড়াইকে পরিচালনা করতে হবে।

তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে জুম্ম জনগণ মনে করেছিল শাসকগোষ্ঠীর সকল অন্যায়-অবিচার অবসান হবে। কিন্তু আমরা আজকে দেখি ২৮ বছরেও সেটা হয়নি। কারণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে নতুন করে নানাভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। আমাদের জুম্ম সমাজের একটি প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী

গোষ্ঠীও সেখানে যুক্ত হয়। আমাদের সেই ইতিহাসকে জেনে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনের লড়াইকে পরিচালনা করতে হবে। শাসকগোষ্ঠীর সকল হীনষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের কীভাবে আরো সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় যেই প্রশ্ন আমাদের করা প্রয়োজন।

জগদীশ চাকমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ হলো জুম্ম ছাত্র সমাজের লড়াকু, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন। সেই ধারাবাহিকতায় আজকে মিরপুর শাখার কাউন্সিল ও সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পিসিপির নেতৃত্বকে গতিশীল এবং অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে যেতে হবে। সেভাবে নিজেকে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে পিসিপি সামনে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে গিয়ে জাতির জন্য তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে যাবে এই আশা ব্যক্ত রাখছি।

মেরিন চাকমা বলেন, বর্তমান পিসিপি অনেক অনেক অগ্রগামী। আমাদের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প পথ আর নেই। যুগে যুগে আমরা দেখেছি জাতির প্রয়োজনে ছাত্র সমাজ বারে বারে এগিয়ে এসেছে সেই জায়গা থেকেও আজকে জাতির প্রয়োজনে পিসিপির গুরুত্ব অপরিসীম।

সম্মেলন শেষে সভাপতি হিসেবে পুনরায় অভি চাকমা, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ভরত চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সুজন চাকমাকে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এডিশন চাকমা।

পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার ৩২তম কাউন্সিল সম্পন্ন

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' স্লোগানকে সামনে রেখে গত ৮ নভেম্বর ২০২৫ বিকাল ৩:৩০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি)'র মুনীর চৌধুরী হল রুমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও ৩২তম কাউন্সিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য অনন্ত বিকাশ ধামাই, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমা।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিদায়ী কমিটির তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কনেজ চাকমা এবং সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক হ্লামংচিং মারমা।

অনন্ত বিকাশ ধামাই বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। পাহাড়ে ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া ও সেনাশাসন চলমান রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে জুম্মদেরকে নিপীড়ন ও শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট করে রেখেছে। জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের অধিকতর লড়াই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

রুমেন চাকমা বলেন, দেশে বর্তমানে মৌলবাদের কালো থাবা পড়েছে। দেশ একদিকে নির্বাচনের ডামাঢোলে আক্রান্ত, অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিক অভিযান চলমান রয়েছে। যা এক দেশে দুই নীতিরই সামিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে অকেজো করে দেওয়ার জন্য সেটেলার বাঙালিরা একের পর এক ষড়যন্ত্র চলমান রেখেছে যার পেছনে সরাসরি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। জুম্ম জনগণের উপর চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে বৈধতা দেওয়ার জন্য কতিপয় গণমাধ্যম নেতিবাচক ন্যারেটিভ তৈরি করছে। জুম্ম ছাত্র সমাজকে প্রগতিশীল আদর্শে আদর্শিত হয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে অবশ্যই সামিল হতে হবে।

চন্দ্রিকা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ শুধু একটি নাম নয়, এটি জুম্ম তারুণ্যের সংগ্রাম ও প্রতিবাদের একটি কণ্ঠস্বর। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যতীত আমাদের মুক্তি নেই। জুম্ম জনগণের উপর নির্যাতন বন্ধ ও আদিবাসী নারী ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য আমাদের তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

জগদীশ চাকমা বলেন, আমরা জুম্ম জনগণ স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছি ঠিকই কিন্তু আমরা অধিকার বঞ্চিত। আমরা আমাদের যথাযথ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে যে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চলমান রয়েছে, সেই সংগ্রামে আমাদের তরুণ সমাজকে জোরালোভাবে ভূমিকা রাখতে হবে।

পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি জগদীশ চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে সঞ্চালনা প্রদান করেন সাধারণ সম্পাদক সৈসানু মারমা।

পরিশেষে কনেজ চাকমাকে সভাপতি, হ্লামংচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে পায়া ম্রো'কে নির্বাচিত করে ২৯ সদস্যবিশিষ্ট ৩২তম কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে পিসিপি, ঢাকা মহানগর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো।

বাঘাইছড়িতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ভাস্কর্য উন্মোচন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৯ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ১০ ঘটিকায় বাঘাইছড়ির সার্বোয়াতুলি ইউনিয়নের শিজক কলেজ সংলগ্ন কলেজ পাড়ায় জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক সাংসদ মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ভাস্কর্য (আবক্ষ মূর্তি) উন্মোচন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এবং ভাস্কর্য উন্মোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ও কাচালং ডিগ্রী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ দেওয়ান, শিজক কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক শান্তনা তালুকদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এম এন লারমা'র আবক্ষ মূর্তিটি উন্মোচন করেন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা। একই সময়ে এম এন লারমার আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধনের দিনটিকে (৯ নভেম্বর) স্মরণীয় রাখতে এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মহান নেতার স্মরণে 'মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মারক সংকলন' নামে একটি প্রকাশনা বের করা হয়।

উক্ত এন লারমা ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেন ভাস্কর্যশিল্পী ও আর্ট কিউরেটর জিংমুন লিয়ান বম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের সাবেক শিক্ষার্থী। তাঁর শিল্পকর্মে পাহাড়ি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিকতার ছোঁয়া প্রতিফলিত হয়। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণের মাধ্যমে তিনি শুধু একজন ঐতিহাসিক নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাননি, বরং পাহাড়ি মানুষের সংগ্রামী চেতনারও শিল্পিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আলোচনা সভায় ঊষাতন তালুকদার বলেন, যে জাতি ত্যাগ স্বীকার করতে জানে না, সে জাতি বাঁচতে পারে না। যাঁরা মরতে জানে, তাদেরকে সবাই ভয় করে। সব জাতি সমীহ করে। এখন সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখলেও এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, তাঁরা একসময় বাধ্য হয়েছিল আমাদের সঙ্গে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে। আমি নিজের কানে শুনেছি, জেনারেল মঞ্জু নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন 'শান্তিবাহিনীরা সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত এবং আমরা রণ-ক্লান্ত। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা ছাড়া বিকল্প উপায় নেই।' এরপর তাঁরা বাধ্য হয় আমাদের সাথে চুক্তিতে উপনীত হতে।

তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা জুম্মরা কী পারি না? আমাদের তরুণরা কী পারে না? আমরা সবকিছু পারি। আমরা করে দেখিয়েছি। আপনাদেরকে স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কাজে নামতে হবে।

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, এম এন লারমার আদর্শ, তাঁর জ্ঞান, আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ধারণ করে আমরা আমাদের প্রজন্মকে নতুনভাবে পুনর্জন্ম, নতুনভাবে অনুপ্রাণিত আমরা যতটুকু পেরেছি করেছি, বাকিটা তারা কাঁধে নেবে, এই দায়িত্ব তাদেরকে অর্পণ করার অভিপ্রায় নিয়ে আমি আজকে ৭৮ বছরের বৃদ্ধ, শারীরিক অসুস্থতায় থেকেও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার অনুরোধ বা আদেশকে আমি উপেক্ষা করতে না পেরে বাঘাইছড়িতে ভাস্কর্যটা নির্মাণের কাজ সমাপ্তির উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, সাধারণভাবে এই ভাস্কর্যটা দেখলে ইট-কংক্রিট-সিমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। আর যদি একটু গভীরে গিয়ে দেখি, তাহলে আমাদের সামনে লারমার চেহারা ভেসে উঠবে। আর যদি আমরা আরও গভীরে গিয়ে দেখি তাহলে প্রকৃতভাবে লারমার চেহারা, তাঁর জীবন, তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।

দেবপ্রসাদ দেওয়ান বলেন, এম এন লারমাকে শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসীদের একজন নেতা হিসেবে ভাবলে বা মনে করে থাকলে সেটা দ্বারা আমাদের সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ পাবে। শৈশব থেকে আমৃত্যু যদি আমরা এম এন লারমার জীবনকে অধ্যয়ন করি তাহলে দেখতে পাবো, তিনি বাংলাদেশের সকল অবহেলিত, উপেক্ষিত, খেটে-খাওয়া ও মেহনতী মানুষের হয়ে, নারীদের হয়ে কথা বলেছেন। তাই এই ভাস্কর্য সেই সকল মানুষের প্রতীক। তাঁর আদর্শের প্রতীক। তাঁর সংগ্রাম ও চেতনার প্রতীক।

শান্তনা তালুকদার বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নারী অধিকার নিয়ে ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। তিনি সংসদে গিয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অধিকারের কথা বার বার উত্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অবহেলিত, নির্যাতিত এবং নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের কথাও সংসদে উত্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির তাগিদে সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সালে এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পুলক জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিবরন চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ভাস্কর্য নির্মাণ কমিটির সম্মানিত সদস্য সচিব ত্রিদীপ চাকমা (দীপ)।

উল্লেখ্য যে, ভাস্কর্যটি নির্মাণের জন্য কনক বরণ চাকমা ০.২০ একর জায়গা দান করেন। ভাস্কর্যের ধরন: আবক্ষ ভাস্কর্য, উচ্চতা: ৬'.৬", প্রস্থ: ৪'.০" (প্রায়), গভীরতা: ২'.৬" (প্রায়), মাধ্যম: মার্বেল পাথর, রঙ: সাদা মার্বেল, নকশা: বাস্তবধর্মী (জবধষরংঃরপ ঝঢ়ুষব), ব্যস: ৬'.৫", মুখাবয়ব: দৃঢ় ও চিন্তাশীল, যা তাঁর নেতৃত্ব ও মানবিক চেতনা প্রকাশ করে। এম এন লারমার ভাস্কর্য নির্মাণের শিল্পী ছিলেন জিংমুন লিয়ান বম এবং সহকারি শিল্পী ছিলেন অমিত কোচ।

চবিতে পিসিপি'র উদ্যোগে এম এন লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আরম্ভ

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে গত ৯ নভেম্বর ২০২৫ চবিতে

অধ্যয়নরত সকল আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও 'মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫' উদ্বোধন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

দুপুর ১:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এবারের আসরের প্রথম ম্যাচ আরম্ভ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ এযাবৎ শোষিত-নিষ্পেষিত ও অধিকারহারা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও পিসিপি, চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এনতেস চাকমা প্রমুখ।

সুমন চাকমা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র সংগ্রামী আদর্শ বর্তমানে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের চরম সংকটের সময়ে অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এম এন লারমা আমাদের ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে লড়াই করে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ এখনো পর্যন্ত জুম্ম তরুণের মননে লালিত হয়। মহান পার্টি জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনের ডাকে এই জুম্ম তরুণরা সাড়া দিচ্ছে। শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের এক একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সকলের উচিত নিজে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া এবং অপরকেও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এম এন লারমা'র আদর্শ প্রসারিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এই বিশাল জুম্ম ছাত্র সমাজ প্রজন্মের দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে আসলে আন্দোলনকে আমরা অধিক তরান্বিত করতে সক্ষম হবো।

উদ্বোধনী ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম হিল স্পিরিট মাউরুম ও

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম নেক্সট টার্গেট। প্রথম ইনিংসে হিল স্পিরিট ৭৭ রান সংগ্রহ করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নেক্সট টার্গেট ৫৮ রান সংগ্রহ করে। উদ্বোধনী ম্যাচে হিল স্পিরিট ১৯ রানে জয় লাভ করে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ অর্জন করেন হিল স্পিরিটের পরান্টু চাকমা।

উদ্বোধনী দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম হিল ডাইনামাইটস ও ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের টিম প্রবাহন। হিল ডাইনামাইটস প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮৮ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রবাহন ৮৯ রানের টার্গেটে ৬১ রান সংগ্রহ করে ২৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়। এই ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবে নির্বাচিত হন হিল ডাইনামাইটসের সজীব তঞ্চঙ্গ্যা।

উল্লেখ্য, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার স্মরণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে প্রতি বছর মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এই বছরের আয়োজন শুরু হয় আজ। টুর্নামেন্টের এবারের আসরে সর্বমোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করে।

বাঘাইছড়িতে মহান এম এন লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ৯:০০ ঘটিকায় বাঘাইছড়ির সারোয়াতুলি ইউনিয়নের শিজক কলেজ সংলগ্ন নব নির্মিত এম এন লারমার ভাস্কর্য পাদদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাঘাইছড়ি থানা কমিটির উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস ২০২৫ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মিসেস লক্ষীমালা চাকমা এবং ৩০ নং সারোয়াতুলি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ভূপতি রঞ্জন চাকমা প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ।

স্মরণসভায় ৮:৩০ ঘটিকায় কালো ব্যাচ ধারণ, পুষ্পমাল্য অর্পণ ৯:০০ ঘটিকায় এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পিসিপি শিজক কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক জগৎ আলো চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন শিজক কলেজ শাখার সদস্য সুমনা চাকমা।

সভায় উষাতন তালুকদার বলেন, এম এন লারমাকে যারা হত্যা করেছিল তারা ছিল সংগ্রামবিমুখ, তারা বসে বসে খেতে চেয়েছিল, আন্দোলনের ফসল ভোগ করতে চেয়েছিল, অন্যদেশ থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করে অধিকার ফিরিয়ে এনে দেবে এমন পরনির্ভরশীল চিন্তাভাবনা ছিল তাদের। তাই সেই মোহে, লোভে এম এন লারমাকে তারা হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। প্রতি পদে পদে তাদের সেই কর্মের নির্মম ফল ভোগ করতে হয়েছে, এখনো তাদের উত্তরসূরি প্রজন্মকে সেই ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, আজকের এই স্মরণ সভায় ছাত্র ও যুব সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ এইটা প্রমাণ করে যে ছাত্র ও যুব সমাজ তথা জুম্ম জনগণ আমাদের প্রিয় নেতা, জাতীয় নেতার প্রতি, জনসংহতি সমিতির প্রতি এখনো অগাধ ভালোবাসা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা রেখেছে। আপনাদের এই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস আমাদের জুম্ম জাতিকে একদিন অধিকার ফিরিয়ে এনে দেবে, মুক্তি এনে দেবে।

লক্ষ্মীমালা চাকমা বলেন, বাংলাদেশের লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এম এন লারমাই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাদের জুম্ম জাতি নিয়ে ভেবেছিলেন, চিন্তা করেছিলেন, জুম্ম জাতির মুক্তির কথা, অধিকারের কথা ভেবেছিলেন।

ভূপতি রঞ্জন চাকমা বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যদি না জন্মাতেন তাহলে এই জুম্ম জাতি পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতেন কিনা আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। আজকে তিনি জন্মেছেন বলে জুম্ম জাত এখনো মাথা উচু করে পৃথিবীর বুক টিকে আছে। টিকে থাকার স্বপ্ন দেখে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিবরন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংগ্রামী সভাপতি শ্রী পুলক জ্যোতি চাকমা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা শাখার সদস্য জ্যোতিষ্মান চাকমা।

রাঙ্গামাটিতে মহান নেতার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা ও প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠিত

১০ নভেম্বর ২০২৫, সোমবার রাঙামাটিতে বিপ্লবী নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে স্মরণ সভা ও প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সকাল ৮:৩০ ঘটিকায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি হতে প্রভাত ফেরি শুরু করে ডিসি অফিস ও বনরুপা বাজার ঘুরে এসে জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে মহান নেতার স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী বেদির পাদদেশে এসে শেষ হয়।

প্রভাত ফেরি শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ রাঙ্গামাটি শহরের বিভিন্ন ক্লাব, গ্রাম, পেশাজীবী সংগঠন ও ব্যক্তিগণ ফুল দিয়ে মহান নেতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত স্মরণসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি গঙ্গা মানিক চাকমার সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুনির্মল দেওয়ানের নেতৃত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা। এছাড়াও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহসভাপতি ভবতোষ দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা ও পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ সভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমা। শোক প্রস্তাবের পর শহীদের স্মরণে ২মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি শিশির চাকমা বলেন, আমাদের আত্মপরিচয় নিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য এম এন লারমা পথ দেখিয়ে গেছেন। আজকে আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। আমরা জানি, বিভাজনের রাজনীতি আমাদের নিঃশেষ করে দিচ্ছে। আপামর মানুষ হতাশায় নিমজ্জিত। তবে ইতিহাসের দায় আছে, ইতিহাসেরও রায় আছে। বিভেদের বীজ রোপণকারীদের বিরুদ্ধে, শাসকগোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্ম একদিন সেই ঐতিহাসিক দায় থেকে রায় নির্ধারণ করবে। জনমানুষের দীর্ঘশ্বাস, ভিন্ন ভাষাভাষী চৌদ্দটি জাতির ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত করে দেওয়ার শাস্তি অবশ্যই সময় নির্ধারণ করে দেবে সেই বিভেদপন্থীদের। আমরা জানি কারা প্রকৃতার্থে আন্দোলন করছে। কাজেই আমাদের বোকা বানানো যাবে না।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে-আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর সমন্বয়ে কী সুন্দর একটা শাসনব্যবস্থা তৈরি হতে পারতো। কিন্তু বিগত সরকারগুলো তো সেটা হতে দিলো না। তারা প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে গেল। সামনে নির্বাচন আসছে যে ক্ষমতায় যাক আমি বিশ্বাস করি না, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে ভাববে, তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করবে। জুজুর ভয় দেখিয়ে পাহাড়ে দমননীতি জারি রাখা হবে।

প্রধান আলোচক সাধুরাম ত্রিপুরা বলেন, ৪২ বছর আগে ঘটে যাওয়া একটা হৃদয়বিদারক ঘটনাকে পুরো জুম্ম জাতি শোকাবহ আবহে স্মরণ করছে। আমরা লারমার অভাববোধ অনুভব করি একইসাথে বিভেদপন্থী ঘাতকদের উদ্দেশ্যে ঘৃণাভরে ধিক্কার জানাই। সেই বিভেদপন্থীদের সমূলে উৎখাত করে জুম্ম জনগণের মাঝে বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম বেগবান করতে হবে। বিভেদপন্থী ও সুবিধাবাদীদের প্রতিহত করার সংগ্রাম শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামেরই অংশ।

তিনি আরও যোগ করে বলেন, সমস্ত রকমের বিভেদপন্থা ও সুবিধাবাদীতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করে একজন প্রকৃত অর্থে জুম্ম হয়ে ওঠে জুম্ম জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে বেগবান করার ছাড়া বিকল্প পথ খোলা নেই।

এডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান বলেন, '৮৩-র ঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলায় এম এন লারমার প্রয়াণে জাতিকে স্তব্ধ করেছিলেই ঠিকই কিন্তু তাঁর অভাববোধ জাতিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। জুম্মরা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামকে বেগবান করেছিল। যে সংগ্রাম ৯৭ অবধি গড়িয়ে পার্বত্য চুক্তি নিয়ে আসে। আজকে সেই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যেই সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে।

আশিকা চাকমা বলেন, ১০ নভেম্বর জুম্ম জাতীয় জীবনের বেদনাদায়ক এক অধ্যায়। চার কুচক্রী ঘাতকেরা লারমাকে

হত্যা করে জুম্ম জনগণের স্বপ্নকে গলাটিপে হত্যা করেছিল। আজও সেই নরপশু ঘাতকদের উত্তরসূরীরা পাহাড়ে বিভেদের চর্চা করে যাচ্ছে। সমাজে দিকে দিকে সুবিধাবাদীরাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পার্টির প্রতিষ্ঠা থেকে আজ অবধি শত শত মুক্তিকামী আত্মবলিদান দিয়েছেন, অনেক জুম্ম নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন-তাদের ত্যাগকে আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না।

বান্দরবানে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বান্দরবান জেলা সদরস্থ মাস্টার গেস্ট হাউজ সম্মেলন কক্ষে গত ১০ নভেম্বর সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহসভাপতি মেঞোচিং মারমার সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক জলিমং মারমা। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উছোমং মারমা, মানবাধিকার কর্মী লেলুং খুমী, আদিবাসী ব্যক্তিত্ব ক্যাসামং, পিসিপি'র উশৈহ্লা মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উলিসিং মারমা, বিএমএসসি বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক উক্যমং মারমা, মহিলা সমিতির সদস্য মেনিপ্রু মারমা প্রমুখ।

প্রধান আলোচক জলিমং মারমা বলেন, জুম্ম কোন একক চাকমা জাতির শব্দ না। এটি পাহাড়ের সকল জাতিকে সংগঠিত করার একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে ১৪টি জুম্ম জাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এম এন লারমাকে হত্যার পেছনে দেশি-বিদেশী অপশক্তি জড়িত ছিল। তাঁকে হারিয়ে জাতিতে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন হয়েছে। জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সকলকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মেনিপ্রু মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটি রাজনৈতিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। ষাট-সত্তর দর্শকে এম এন লারমা ছিলেন নিপীড়িত-নির্যাতিত অধিকার হারা মানুষের প্রেরণার এক নাম। তিনি নারী পুরুষের সমতা সম্পর্কেও সোচ্চার ছিলেন। এম এন লারমা আদর্শকে পালন করতে হলে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ভুলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

লেলুং খুমী বলেন, এম এন লারমা শুধু অবিসংবাদিত নেতা নন, তিনি ছিলেন একটি আদর্শের নাম। আমি মনে করি এম এন লারমা জন্ম না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেএসএস জন্ম হতো না আর জেএসএস জন্ম না হলে পাহাড়ের মানুষ অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতো না। এজন্য সামাজিক সংগঠনগুলোকেও অস্তিত্ব রক্ষায় ঐক্যের সাথে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া বিকল্প নাই বলে মনে করি।

সুমন মারমা বলেন, কিছু অপশক্তি এখনো জুম্ম জনগণকে বিভাজন করতে তৎপর। এদিকে রাষ্ট্রযন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে দিন দিন বহিরাগত অনুপ্রবেশ করিয়ে স্থায়ী পাহাড়ী-বাঙালির অধিকারকে খর্ব করে যাচ্ছেন, অপরদিকে জুম্মরা এখনও জুম্ম জাতীয়তার ভিত্তিতে সুসংহত নয়। জাতিগত সমস্যার প্রশ্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প পথ নেই।

স্মরণ সভা শুরুতে এম এন লারমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ২ মিনিট মৌনব্রত পালন করা হয়। এবং শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এঞোসিং মারমা।

ঢাকায় এম এন লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার (এম এন লারমা) ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১০ নভেম্বর বিকাল ৩ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদ বকুলতলা প্রাঙ্গণে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক সোহরাব হাসান; নাজমুল হক প্রধান, সাবেক সাংসদ ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের জাসদ; রাজেকুজ্জামান রতন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল; আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি; জাকির হোসেন, যুগ্ম সমন্বয়কারী, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন; অ্যাডভোকেট আসাদুল্লাহ তারেক, সাধারণ সম্পাদক, ঐক্য ন্যাপ; দীপায়ন খীসা, কেন্দ্রীয় সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি; এহসান মাহমুদ, লেখক ও সাংবাদিক; সাইফুর রহমান তপন, সাংবাদিক; এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা ও নারী নেত্রী শিরিন হক প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

স্মরণসভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা।

উক্ত স্মরণ সভায় সোহরাব হাসান বলেন, গণ মানুষের নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন একজন গরিব মেহনতি মানুষের নেতা। তিনি কেবল পাহাড়ি মানুষের নেতা ছিলেন না। বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সমগ্র নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তিনি বাহাত্তরের সংবিধানে আদিবাসী, শ্রমিক মেহনতি মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। সংসদে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন যে, তিনি একজন চাকমা, একজন চাকমা কোনদিন বাঙালি হতে পারে না। তার লড়াই ছিল বাঙালি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত আদিবাসী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।

সাইফুর রহমান তপন বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা চিন্তা ছিল সবসময় যুগের চেয়ে অধিক প্রাগ্রসর। তিনি সবসময় শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য লড়াই করেছিলেন। তার চিন্তা ও চেতনা আজ বাংলাদেশের জন্যও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেন, '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের সময় আদিবাসী-বাঙালি উভয়ই অংশগ্রহণ করেছিল। অথচ আজকে সেই নিপীড়িত আদিবাসীদের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে।

দীপায়ন খীসা বলেন, জুলাই সনদে আজকে আদিবাসী মানুষের কথা বলা নাই। অথচ, কেবল মুখে বহুত্ববাদী, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলা হচ্ছে। বিগত সময়ের দলীয় সরকার না হয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার তো কোনো দলীয় সরকার না। তারা তো নিপীড়িত আদিবাসী মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। '২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী পাহাড়ি আদিবাসীরা কমপক্ষে ২ টি সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছেন।

অ্যাডভোকেট আসাদুল্লাহ তারেক বলেন, '২৪ এর আকাঙ্ক্ষা আজ হাইজেক হয়ে গেছে মৌলবাদী শক্তির কাছে। '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান যে চেতনা নিয়ে শুরু হয়েছিল আজ সেই চেতনা মৌলবাদী শক্তির কাছে লুট হয়ে গেছে। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম আদিবাসী-বাঙালির এই বাংলাদেশে অবস্থান করবেন। ৭০ দশকে নতুন বাংলাদেশে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সেই স্বপ্ন দেখছিলেন, যে স্বপ্ন একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার, গরীব মেহনতি তথা নিপীড়িত পাহাড়ি আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুনেছিলেন।

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, ৭২ সংবিধানে নিপীড়িত মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়নি, নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপ এবং মেহনতি মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা তুলে ধরা হয়নি। সেসময় শোষিত মানুষের বন্ধু মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তাদের হয়ে কথা বলেছেন। তিনি সংবিধান প্রণয়নের সময় শ্রমিক, গরীব, আদিবাসী নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছিলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাত্যাভিমানে মগ্ন শাসকগোষ্ঠীকে চোখ রাঙিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় থেকে

শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার হারা মানুষের হয়ে কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন।

নাজমুল হক প্রধান বলেন, বাংলাদেশের ১৯৭১ সালে ভূখণ্ড পেলেও কিন্তু এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের যত রাজনৈতিক দল আছে তারা অন্য জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার মত মানসিকতা এখনও তৈরি করতে পারেনি। ভোটের আগে মুখে বললেও তা বাস্তবে বাস্তবায়ন করে না।

আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জাতির জন্য ছাত্র জীবন থেকে অধিকারের কথা বলেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে যখন বাঙালি বলে আদিবাসী মানুষের পরিচয় করে দিতে চেয়েছিলেন সেই সময় গণপরিষদে এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন। যখন তিনি প্রতিবাদ করতেন তখনও তার কণ্ঠকে রোধ করার জন্য চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত বিকল্প পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার গজেন্দ্র নাথ মাহাতোর সভাপতিত্বে উক্ত স্মরণ সভায় সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব হিরন মিত্র চাকমা ও ত্রিজিনাদ চাকমা।

স্মরণ সভার শেষে প্রতিবাদী গান, কবিতা পাঠ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লখ্য, জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বর বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় আটজন সহযোদ্ধাসহ এম এন লারমা নিহত হন।

বরকলে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বরকল থানা শাখার উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য শ্যাম রতন চাকমা, কার্বারী এসোসিয়েশনের বরকল উপজেলার সভাপতি নন্দ বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বরকল থানা শাখার সদস্য বিশাখা চাকমা ও সাবেক ছাত্র নেতা লক্ষী মন চাকমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিশান তালুকদারের সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা শাখার সভাপতি ইলেন চাকমা। স্মরণ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রিন্টু চাকমা ও শোক প্রস্তাব পাঠ করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বরকল থানা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক জিতেশ চাকমা।

প্রধান অতিথি বিধান চাকমা বলেন, পাবর্ত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া পাবর্ত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের জুম্ম জনগণকে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। যারা প্রত্যক্ষভাবে পার্টির সাথে জড়িত শুধু তারাই সংগ্রাম করতে পারে এমন কোনো কথা নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪ টি জাতিসত্তার উচিত এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হওয়া।

বিশেষ অতিথি নন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, মহান নেতা এম এন লারমার দেখানো পথ প্রতিটি জুম্ম জনগণের ধারণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাত্র ও যুব সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস জেনে, আগামী দিনের সংগ্রামের পথচলায় সামিল হতে হবে।

বিশেষ অতিথি লক্ষী মন চাকমা বলেন, মহান নেতা এম এন লারমার আদর্শ, চিন্তা চেতনা প্রতিটি জুম্ম জনগণের ধারণ করা উচিত। এম এন লারমা দেখিয়ে গেছেন কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়, কিভাবে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হয়। কারোর বক্তব্য শুনে যতটুকু জানা সম্ভব তার চেয়ে বেশি সম্ভব বই পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইতিহাস পড়ে। তরুণ ছাত্র সমাজ যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিশেষ অতিথি বিশাখা চাকমা বলেন, ১৯৮৩ সালের আজকের এই দিনে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা-সহ আট

সহযোদ্ধাকে বিভেদপন্থী চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তিনি ১৯৮৩ সালের এই দিনে মহান নেতা এম এন লারমাসহ যারা মৃত্যুবরণ করেন এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

সকালে সভাপতির বক্তব্য'র মাধ্যমে স্মরণ সভা অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন। স্মরণ সভার আগে, অস্থায়ী শহীদ বেদিতে পুষ্পামাল্য দিয়ে মহান নেতা এম এন লারমা ও সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিকালে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়ানো হয়।

এছাড়াও মহান নেতা এম এন লারমাসহ সকল শহীদের স্বরণে বরকল উপজেলার আইমাছড়া এলাকাবাসীর উদ্যোগে জগন্নাথ ছড়া পাড়াতে এক স্বরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন, আইমাছড়া মুখ, জগন্নাথ ছড়া গ্রাম, দিগলছড়ি গ্রামসহ সকল গ্রাম কমিটি, যুব সমিতিসহ আইমাছড়া এলাকার অধিকাংশ প্রগতিশীল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দীঘিনালার মাইনী ভ্যালির দুর্গম এলাকায় ১০ই নভেম্বর পালিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত মাইনি ভ্যালির দুর্গম এলাকায় জনসাধারণের উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস-২০২৫ উপলক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাবুছড়া ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান গগণ বিকাশ চাকমা, ৩৫ নং ডুলুছড়ি মৌজা হেডম্যান সূর্য বিজয় তালুকদার, ৩৬ নং কুকিছড়া মৌজা হেডম্যান শান্তি কুমার চাকমা, ৩৭ নং সৌদ্দেংছড়া মৌজা হেডম্যান অলঙ্গ ভূষণ দেওয়ান, মহিলা মেম্বার প্রতিভা চাকমা, নাড়াইছড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নান্টু চাকমা, বাবুছড়ার প্রাক্তন মেম্বার ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মেরিন চাকমাসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রায় ৮০০ জন স্থানীয় কার্বারি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি ওয়ার্ড মেম্বার এবং স্থানীয় জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ৭:৩০ টার সময়ে গণজমায়েত ও কালো ব্যাস ধারণ করে সকাল ৮ টায় অস্থায়ী শহীদ বেদীতে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

সকাল ৯ টায় স্মরণ সভার আলোচনার শুরুতে শোক প্রস্তাবসহ শহীদের সম্মান জানিয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আয়োজিত সভায় স্বাগত বক্তব্যে প্রদান করেন দোজর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি পদ্মলাল চাকমা।

তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় পরে এ দুর্গম এলাকায় আমরা সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছি। এত জনসমাগম অতীতে উক্ত এলাকায় কোনোদিন সম্ভব হয়নি। এম এন লারমা জুম্ম জাতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তার দেখানো পথ ধরে আমরা এখনো সংগ্রামে রত রয়েছি।

এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ১০ই নভেম্বর '৮৩ স্বরণে তিনটা কবিতা আবৃতি পাঠ করা হয়।

প্রাক্তন মেম্বার ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মেরিন চাকমা বলেন, মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিষয়ে সকলের জানা থাকা প্রয়োজন। গোটা বিশ্বের জুম্ম জনগণ আজকের এই দিনটাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। ১০ই নভেম্বর দিনে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাস-ঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় মহান নেতাকে হত্যার ঘটনা জাতির জন্য ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

স্কুল শিক্ষিকা হ্যাপী চাকমা বলেন, এম এন লারমা জুম্ম জাতির পিতা তা আমরা সবাই জানি। ছাত্র-যুব সমাজ দেশ ও জাতির জন্য কাজ করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা একদিন নিশ্চয় নিজেদের অধিকার ফিরে পাবো। এজন্য শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে। দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

স্মরণ সভায় নাড়াইছড়ি জুনিয়র স্কুলের প্রধান শিক্ষক নান্টু চাকমা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে স্মরণ করা মানে তার দেখানো পথ ধরে এগিয়ে চলা। দীর্ঘ বছর পর দুর্গম এ এলাকায় আমরা সমবেত হয়ে আমরা ১০ই নভেম্বর দিনটি পালন করছি। আজকে যার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রয়েছে তারাও জানবে আমাদের মহান নেতার সংগ্রামী পথচলা। তরুণ ছাত্র-যুব সমাজকে এম এন লারমার শিক্ষা কি তা জেনে নিতে হবে। শিক্ষার সুযোগকে ধারালো করার পাশাপাশি অভিভাবক সমাজকে ও নিজেদের সন্তানদের সে শিক্ষা দিতে হবে।

ওয়ার্ড মেম্বার প্রতিভা চাকমা তার আলোচনায় বলেন, অধিকার পাওয়া নিশ্চয় সহজ বিষয় নয়। এম এন লারমা দেখিয়ে যাওয়া পথ ধরে আমরা যদি একসঙ্গে চলতে পারি তাহলে একদিন অধিকার ও অস্তিত্ব নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। এলাকায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের জন্য কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

স্মরণ সভার অন্যতম আলোচক বাবুছড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গগণ বিকাশ চাকমা বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট তা আমাদের জন্য অনুকূলে নয়। ভাগ করো শাসন করো নীতিতে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভাজিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। রাষ্ট্র শাসক কর্তৃক আমাদের জুম্ম জাতিকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার যে কৌশল তা একমাত্র মহান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই তিনি সে সময়কার সংসদে দাঁড়িয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, তা আজ আমাদের শিক্ষা দেয়।

এছাড়াও মৌজার হেডম্যান প্রতিনিধিরা ও উক্ত স্মরণ সভায় সংক্ষিপ্তভবে বক্তব্য প্রদান করে এবং সন্ধ্যা ৫ টার সময়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সমাপ্ত করা হয়।

লংগদুতে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ লংগদু উপজেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।

ছোট মাহিল্যা, জারুল ছড়া, গুলশাখালী শান্তিনগর, রাঙ্গীপাড়া, গুইছড়ি, নোয়াপাড়া, রনজিত পাড়া, চিবেরেগা, চাল্যাতুলি, খাগড়াছড়ি, শীলকাটা ছড়া, কেরেঙাছড়ি ইত্যাদি গ্রাম সমন্বয় করে শোক দিবস পালন করা হয়।

সকাল ৮টায় জমায়েত ও কালো ব্যাজ ধারণ, সকাল ৯টায় অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৯:৩০টায় শোক প্রস্তাব পাঠ ও ২মিনিট নীরবতা পালনসহ স্মরণ সভা আরাম্ভ, সন্ধ্যা ৬টায় অস্থায়ী শহীদ বেদী ও প্রত্যেক ঘরে ঘরে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক কমিটির পরিচালক ও সহ-পরিচালকগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে ৩নং গুলশাখালী ইউনিয়নের সকল গ্রাম কমিটির সাথে সমন্বয় করেন সহ-পরিচালক অয়ন্তি ময় চাকমা ও শুভ শান্তি চাকমা, ৪নং বগাচতর ইউনিয়নের সকল গ্রাম কমিটির সাথে সমন্বয় করেন সহ-পরিচালক যশু চাকমা ও তপন জ্যোতি চাকমা এবং ৫নং ভাসন্যাদম ইউনিয়নের সকল গ্রাম কমিটির সাথে সমন্বয় করেন বিধান চাকমা ও প্রদীপ কুমার চাকমা।

শোক সভায় বক্তারা মহান নেতা এম এন লারমাসহ মহান শহীদদের অবদান স্মরণ করেন এবং বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রদের ধিক্কার জানান। এম এন লারমার গড়ে তোলা আন্দোলনের ফসল হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। কিন্তু দেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চুক্তিতে জুম্ম জনগণের অধিকার স্বীকার করে নিলেও চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। জুম্ম জনগণের অধিকার সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তরুণ সমাজকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

বান্দরবানে বিভিন্ন জায়গায় মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সহযোগী ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বান্দরবান সদর উপজেলা, রুমা, থানচি, লামা এবং নাইক্ষ্যংছড়িতে প্রয়াত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

বান্দরবান সদর উপজেলা: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান উত্তরাঞ্চল কমিটির উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এম এন লারমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর স্মরণ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন হেডম্যান যোসেফ ত্রিপুরা, সুইচাউ মারমা, বিপ্লব মারমা প্রমুখ। এতে বান্দরবান সদরের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন অংশগ্রহণ করেন বলে জানা গেছে।

রুমা: রুমায় জনসংহতি সমিতির বিভিন্ন সহযোগী ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে বিপ্লবী এন এম লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এতে রুমার বিভিন্ন গ্রামের লোকজন অংশগ্রহণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

থানচি: থানচির বলি পাড়ায় শত শত জনসাধারণের অংশগ্রহণে এম এন লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মংসাচিং মারমা।

স্মরণ সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠ, মৌনব্রত পালন করাসহ সকালে প্রভাত ফেরি করা হয়।

লামা: লামা পৌর এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের জনসাধারণের অংশগ্রহণে মহান নেতা এম এন লারমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নাইক্ষ্যংছড়ি: নাইক্ষ্যংছড়ি সোনাইছড়ি ইউনিয়নে জামিতলি পাড়ায় এলাকাবাসীর উদ্যোগে ১০ নভেম্বর '৮৩ স্মরণে জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোকদিবস ২০২৫ পালিত হয়েছে।

এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মংনু হেডম্যান।

এছাড়াও রোয়াংছড়ি, টংকাবতী, চিম্বুক ও আলীকদমে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে বলেও জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় মহান নেতা এম এন লারমা আটজন সহযোদ্ধাসহ নিহত হন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধিজীবী চত্বর প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা (এম এন লারমা) ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাসহ এযাবৎকালে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

উক্ত স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ আমিরুল ইসলাম,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উৎস চাকমা, উজ্জ্বল বাবু তঞ্চঙ্গ্যা এবং রুয়েটে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী রিমন চাকমা। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং রুয়েটে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরাও এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর মোঃ আমিরুল ইসলাম বলেন, এম এন লারমা ছিলেন একজন মহান নেতা। যিনি জুম্ম তথা নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকারহীন আপামর জনতার জন্য কথা বলতেন। এম এন লারমার কথা বলতে গিয়ে তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহের সিধু-কানুর কথা উল্লেখ করেন। তিনি সূর্যসেন, প্রীতিলতার কথা বলেন যারা এম এন লারমার মতো আজোও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার শক্তি হিসেবে মূর্ত হয়ে আছেন।

তিনি আরো বলেন, এম এন লারমা এমন এক নেতা ছিলেন যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৪ টি জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিলেন। জুম্ম জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি আরো বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধানে তৎকালীন সরকার স্বতন্ত্র জাতির স্বীকৃতি এবং জুম্ম জাতি তথা শোষিত, নির্যাতিত আপামর জনতার অধিকার সংবিধানে স্থান না পাওয়ায় তিনি সংসদ অধিবেশন বর্জন করেন। তিনি শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী হিসেবে অবদান রাখেন। জুম্ম জাতিকে তিনি অধিকার ও রাজনৈতিক সচেতন করেন।

বিজয় চাকমা বলেন, এম এন লারমার জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তিনি ছোটবেলা থেকে অধিকার সচেতন ছিলেন। পারিবারিকভাবে তিনি সেই শিক্ষাটি লাভ করেছিলেন। ফলস্বরূপ আমরা দেখি তখনকার ঘুণে ধরা জুম্মদের সামন্ত নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি ষাট দশকের কাপ্তাই বাঁধ বিরোধিতাস্বরূপ পাহাড়ের আপামর জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে নিজ দায়বদ্ধতায় উদ্যোগ হাতে গ্রহণ করেন। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি তিনি পাহাড়ের সকল জনগোষ্ঠীকে একই কাতারে সামিল করার জন্য প্রগতিশীল আদর্শের জুম্ম জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ঘটান।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা। সভায় স্বাগতিক বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা।

উল্লেখ্য, ১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ সালে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় মহান নেতা এম এন লারমা আটজন সহযোদ্ধাসহ নিহত হন।

এম এন লারমার ৪২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে আলোচনা সভা ও স্মরণ সঙ্গীতানুষ্ঠান

১০ নভেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রামে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও স্মরণ সঙ্গীত অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রামস্থ প্রেসক্লাব ভবনের ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক মিলনায়তনে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভাটি আয়োজন করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন কমিটি-চট্টগ্রাম।

স্মরণ সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, চট্টগ্রাম এর সভাপতি অশোক সাহা, ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, সিনিয়র সাংবাদিক আলিউর রহমান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সদস্য জুনিয়া ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আদর্শ চাকমার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন কমিটি-চট্টগ্রাম এর আহ্বায়ক তাপস হোঁড়।

এছাড়াও আয়োজিত স্মরণ সভাতে সংহতি বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিউ মারমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য দিশান তঞ্চঙ্গ্যা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিবেক চাকমা। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য স্মরণী চাকমা। সভার শুরুতে মহান নেতা এম এন লারমাসহ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অশোক সাহা বলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সকল শোষিত জনগণের মুক্তিকামী একজন সংগ্রামী নেতা ছিলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন। একাত্তর পরবর্তী সময়েও আমাদের দেশে সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নির্যাতন হয়েছে, গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে তাদের ওপর নিপীড়ন হয়েছে। কিন্তু একটা দেশের কোন একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতিকে ফেলে রেখে তো দেশ গঠন করা যায়না। আমরা যদি মনের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ পোষণ করি তাহলে তো একসাথে চলতে পারব না। দেশের জন্য ভালো কিছু করতে হলে সকলকেই সাথে নিয়ে করতে হবে। দেশের আদিবাসী জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সাথে সকল মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসা দরকার।

প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার বলেন, শাসকের মূল কাজ হল শোষিত গণমানুষের ঐক্যবদ্ধতায় বিভাজন আনা। একটা জাতিগোষ্ঠী যখন শোষিত হয় তখন সকল নিপীড়িত মানুষের সেই শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো উচিত। পাহাড়ী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে কোন আঞ্চলিকতাবাদ নেই, বরং এটি শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে পাহাড়ি মানুষের অধিকারকে স্বীকার করলেও চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সেই অধিকার বাস্তবায়ন করেনি।

অজিত দাশ বলেন, এন এম লারমা পাহাড়ি জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় অনেক কিছু করে গেলেও তিনি কিছু অসমাপ্ত কাজ রেখে গেছে। এ অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি দেশের সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও নায্য অধিকারের জন্য লড়ে গেছেন যা আমাদেরকে সাহস দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার সনদ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন সরকারই দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসেনি।

আলিউর রহমান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বকীয়তা আছে। সেই স্বকীয়তাকে ধরে রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক জাগরণ ঘটান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে গণপরিষদে প্রথম এম এন লারমা প্রতিবাদ করেছিলেন। তার প্রতিবাদের লক্ষ্য ছিল পাহাড়িদের জাতীয় অস্তিত্বকে সংবিধানে স্বীকার করা এবং দেশের আপামর জনগণের অধিকারকে সেখানে স্থান দেওয়া। আজও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের জমি দখলের অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। সরকারের উচিত পাহাড়ের এই সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানে জন্য এগিয়ে আসা।

এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, আজকে আমরা যার স্মরণে এখানে একত্রিত হয়েছি সেই এম এন লারমা ছিলেন একাধারে শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, সংগ্রামী নেতা যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সংগ্রামের পথ দেখান। লারমা পাহাড়িদের আন্দোলন শিখিয়ে মাঝপথে ছেড়ে যাননি। তিনি আজীবন পাহাড়িদের ভাগ্য পরিবর্তনে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, তাদেরকে সংগঠিত করেছেন। একজন চাকমা জনগোষ্ঠীর হয়েও তিনি শুধু চাকমাদের নিয়ে ভাবেননি, তিনি সকল নাগরিকের কথা ভেবেছিলেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তথা সারাদেশের নিপীড়িত জনগণের জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এছাড়াও সংহতি বক্তব্য রাখেন, পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিউ মারমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য দিশান তঞ্চঙ্গ্যা এবং পিসিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিবেক চাকমা।

সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘটে। আলোচনা সভা পরবর্তীতে স্মরণ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্মরণ সংগীত পরিবেশন করেন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পীবৃন্দ।

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন জায়গায় এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও স্মরণ সভা পালিত

১০ নভেম্বর ২০২৫ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভা, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উত্তোলন করা হয়।

জুরাছড়ি: জুরাছড়ি এলাকাবাসীর ব্যানারে আয়োজিত এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এক স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়। সাবেক জুরাছড়ি থানা কমিটির সদস্য নীলা চন্দ্র চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুমিত চাকমা।

সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৮৩ সালে এই দিনে বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রে জুম্ম জনগণের প্রাণের নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করা হয়। শোকাবহ আজকের এই দিনে শোককে শক্তিতে পরিণত করে আগামীতে পার্টি ঘোষিত যেকোন কঠিন কঠোর আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। আগামী দিনের কঠিন কঠোর আন্দোলনের জন্য বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজকে মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। আয়োজিত সভাটিতে অন্তত ২৫০/৩০০ জনের জনসমাগম ঘটে।

এছাড়াও জুরাছড়ি উপজেলার করল্যাছড়ি, মন্ডিরাছড়া, আদেয়াপ ছড়া দুমদুম্যা ছড়া যৌথ উদ্যোগে, বটতলা, ছোট করইদিয়া ও নাকশাতুলদ যৌথ উদ্যোগে, জুরপানি ছড়া ও ঘিলেলুদি পাড়ায় যৌথ উদ্যোগে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। অন্যদিকে, দুলুছড়ি, বালুছড়া, শিলছড়া, কতুজইলী, নলবন্যা এলাকায় মহান নেতার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উত্তোলন করা হয়।

কাউখালী: অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবসে ঘাগড়া কলেজ মাঠে আয়োজিত স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিয়েপ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হ্লাচিমং মারমা, সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (কাউখালী থানা শাখা)। সঞ্চালনা করেন শান্তি মনি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন দীপা চাকমা, সম্পাদিকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমল কার্বারী।

বিলাইছড়ি: বিলাইছড়িতে ৩নং ফারুয়া ইউনিয়নে 'ফারুয়া হেডম্যান কার্বারি এসোসিয়েশন' এর উদ্যোগে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এসময় বক্তাগণ এম এন লারমাসহ ১০ই নভেম্বরের সকল শহীদ ও জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে সকল শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এছাড়াও, রাঙ্গামাটির সদর উপজেলার রাজদ্বীপ, রাঙাপানি, পিটিআই এলাকায় এলাকাবাসীর উদ্যোগে এম এন লারমার ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জুম্ম জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর উদ্যোগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র শফিকুল কবির মিলনায়তনে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বিচারহীনতা সংস্কৃতি' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় এবং যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর যুগ্ম সমন্বয়কারী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান ও নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিরিন হক, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা এবং বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান প্রমুখ।

আলোচনা সভায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন, জনসংহতি সমিতির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৭৬-৯৭ পর্যন্ত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের উপর কমপক্ষে ১৬ টি গণহত্যা পরিচালিত হয়। এসব গণহত্যায় দুই দশকে কমপক্ষে ১ লক্ষ লোক ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং তাদের বহুলাংশেই নিজেদের বাস্তুভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে। প্রসঙ্গত, পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের এসব ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (১৯৯৮-২০১১) ও কাপেং ফাউন্ডেশন (২০১২-২০২৪) এর তথ্যানুসারে বিগত ২৭ বছরে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন সর্বমোট ৯,১৬২ জন। এসবের মধ্যে নারী ও শিশুর উপর সহিংসংতা সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ৫১৩ টি, ২,৮১৪ টি আদিবাসী বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করা হয়েছে। ৩,৬২২ পরিবারকেদের হুমকি দেয়া হয়েছে। ভূমিদস্যুদের হামলায় ৬১৬ পরিবারের জীবনযাত্রা বিপন্ন হয়েছে, ৫,৯৬৬ একর ভূমি ভূমিদস্যুরা জবরদখল করেছে। এছাড়া ও ক্যাম্প স্থাপনের নামে ৩১৬ একর ভূমি এবং ২,২০৫ একর জায়গা দখলের জন্য ভূয়া দলিল তৈরি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, উক্ত ঘটনাগুলোর কোনটির সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার করা হয়নি। যার ফলে এ ধরনের ঘটনাগুলো বার বার সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ধরনের কাঠামোগত বিচারহীনতা দূর করতে হলে শুধু নীতি নয়; বরং আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। পার্বত্য চুক্তির ধারাগুলো পূর্ণ বাস্তবায়ন, ভূমি কমিশনের পুনঃসক্রিয়করণ, ও একটি স্বাধীন মানবাধিকার তদন্ত কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেসামরিক প্রশাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা বাহিনীর দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এভাবে বিচারহীনতার অবসান কেবল একটি রাজনৈতিক বা মানবিক প্রশ্ন নয়, এটি রাষ্ট্রের আইনি বৈধতা ও নাগরিক মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা মানে বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অধিকারসহ মৌলিক মানবাধিকারকে অস্বীকার করার যে খেলা পাকিস্তান আমলে শাসকরা শুরু করেছিলেন সেটি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়েও চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। তদুপরি ঐ অঞ্চলের গণমানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করা হয়েছিল সে চুক্তিটিরও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না।

বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান বলেন, রাষ্ট্রের সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এ দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র সঠিকভাবে পালন করতো তাহলে আজকে আলাদা করে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষদের নিয়ে আলোচনা করতে হতো না। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আনয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করা হয়েছিল। এ চুক্তি বাস্তবায়নে চুক্তির অপর পক্ষ জনসংহতি সমিতি বা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষ থেকে কোন বাধা দেওয়া হচ্ছে না, বরং রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাবের কারণে এ চুক্তির পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং নারীপক্ষের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শিরীন হক বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশেরই একটি অঞ্চল কিন্তু একদিকে সামরিকীকরণ এবং অন্যদিকে গোয়েন্দা তৎপরতা নিয়ে এ অঞ্চলকে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সামরিকীকরণ আর সীমান্ত রক্ষা দুটি আলাদা জিনিস। সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী রাখা দরকার কিন্তু সে বাহিনী যেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন ধরণের ব্যাঘাত তৈরি না করে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, জাতি হিসেবে আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিইনি। সংখ্যাগরিষ্ঠতন্ত্র যে কতটা আত্মঘাতী তা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিলো। যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় তাদেরকে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ মনে করি। তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিলো সে আশা আর এখন দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আরো বলেন, এদেশের কোন সরকারের এখতিয়ার নাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা। সামরিকীকরণ যারা করেছেন সেই সেনাবাহিনী-ই একমাত্র শক্তি যারা চাইলেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী মানুষদের অধিকার এবং শান্তি আনতে পারেন। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে প্রশ্ন করে বলেন, বিগত ৪০ বছরে আপনারা ১০টি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে সফলতার সাথে কাজ করেছেন। সারাবিশ্বে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে পারেন তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করছেন না কেন? তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর যদি সদিচ্ছা থাকে তবে সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না, সেনাবাহিনী-ই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর যুগ্ম-সমন্বয়কারী এবং আলোচনা সভার সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, মানবাধিকার বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র অনুস্বাক্ষর করেছে সেগুলোর যে হালনাগাদ করা হয় সেগুলোতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতামত নিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে দেশের প্রগতিশীল প্রতিযশা মানুষদের আরো এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে আরো অধিক আকারে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে আরো অধিকতরভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বিভিন্ন থানা শাখা ও আদিবাসী মহিলা ফোরামের বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

'আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন, পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন' এই স্লোগানকে সামনে রেখে গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ সকাল ১০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বন্দর থানায় রেশমী কমিউনিটি সেন্টারে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগরের বন্দর থানা শাখা, ইপিজেড থানা শাখা, পতেঙ্গা থানা শাখা, চাঁন্দগাও থানা শাখা, নিউমুরিং ইউনিট কমিটি, মাইলের মাথা ইউনিট কমিটি, বন্দরটিলা ইউনিট কমিটি ও বোর্ড স্কুল ইউনিট কমিটি এবং আদিবাসী মহিলা ফোরাম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কাউন্সিল ও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক এস জে চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা, একই কমিটির সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি হ্লামিও মারমা, আদিবাসী মহিলা ফোরামের সভানেত্রী চিজিপুদি চাকমা।

এই সময় পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম বন্দর থানা শাখার বিদায়ী কমিটি সুজন চাকমা সভাপতিত্বে উক্ত কাউন্সিল ও সম্মেলনে সঞ্চালনা করেন রাসেল চাকমা ও সোনাবি চাকমা। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যান ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা।

শুরুতে উক্ত আলোচনা সভায় পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম বিভিন্ন থানা ও ইউনিট কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভায় এস জে চাকমা বলেন, আমাদের অস্তিত্ব আজ সংকটে। রাষ্ট্র তথা শাসকগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত নির্যাতন,

নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা চালিয়ে যাচ্ছে। তরুণ সমাজকে এই বিষয়ে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের লড়াই অসম। আমাদের লড়াই সংগ্রাম একটি জাতি বা একটি গোষ্ঠী ভিতরে সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের লড়াই সংগ্রাম সকল নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত অধিকারহারা মানুষের জন্য। আমাদেরকে পাহাড়ের সমস্যাকে গভীরে গিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। শাসকগোষ্ঠী দিন দিন ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। সুতরাং ছাত্র ও যুব সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অধিকতর লড়াইয়ে সামিল হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে।

অনিল বিকাশ চাকমা বলেন, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম জন্মলগ্ন থেকেই জুম্ম জনগণ তথা মেহনতি মানুষের অধিকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তরুণদের বুঝতে হবে সেই সাথে নিজেদের অধিকারের প্রতি সচেতন হতে হবে। তারুণ্য শক্তিকে যদি ঐতিহাসিকভাবে কাজে না লাগাতে পারি তাহলে আমরা ব্যর্থ হবো। সকলকে নিজের অধিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য যা যা করার প্রয়োজন সেটা করতে হবে।

জগৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্র আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। এটা আজকের নয়. সেই বাংলাদেশ স্বাধীন পর থেকে। এই শাসন শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় সেই রাস্তা খুঁজতে হবে এই তরুণ প্রজন্মকে। তরুণের যে শক্তি সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে, অধিকার নিয়ে ভাবতে হবে সচেতন হতে হবে, অন্যথায় আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

হ্লামিও মারমা বলেন, আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার প্রতিষ্ঠা লড়াই সংগ্রামে তরুণ প্রজন্ম হতাশ হলে চলবে না, আমাদেরকে লড়াই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে আমাদের প্রবীণ প্রজন্ম আর আমরা হলাম তাদের উত্তরসুরী। তাঁরা রাষ্ট্রকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে আর আমাদের কে সেই চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করতে হবে রাষ্ট্রকে।

চিজিপুদি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের 'ভাগ করো-শাসন করো' নীতিতে প্রতিনিয়ত নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্র যন্ত্র। তরুণ প্রজন্মকে নিজের অধিকারের জন্য এগিয়ে আসতে হবে এবং পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে অধিকতর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে নবনির্বাচিত সকল শাখা কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা।

পিসিপি'র উদ্যোগে চবিতে মহান নেতা এম এন লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫ সম্পন্ন

গত ২২ নভেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫ এর ফাইনাল, সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম; পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা; বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক ইফাজ উদ্দিন আহমেদ ইমু; পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা; বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এর সহ-সভাপতি লালতলাং সাং বম; বাংলাদেশ চাক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মংক্যউ চাক; রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর সম্পাদক ক্যাপ্রিও চাকমা; ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরাম, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার প্রতিনিধি ভাগ্য কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ।

খেলার শুরুতে এম এন লারমাসহ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে এযাবৎ যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিকতা সবকিছুর উর্ধ্বে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে এমন টুর্নামেন্ট আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে আমি সকল স্টুডেন্ট এর সুখে-দুঃখে পাশে থাকার চেষ্টা করি। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমতলের অনেক আদিবাসী শিক্ষার্থী আমাদের ক্যাম্পাসে অধ্যয়ন করে। তাদের উদ্যোগে যেসব অনুষ্ঠান হয় সেগুলোতে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করি। আমরা

সকলেই মিলেমিশে থেকে আগামীতেও ভালো কাজে এগিয়ে যাবো।

অন্তর চাকমা বলেন, যে উদ্দেশ্যে আজকের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করা এবং সে উদ্দেশ্য আমি মনে করি অনেকটা সফল হয়েছে।

ইফাজ উদ্দিন আহমেদ ইমু বলেন, এম এন লারমা শোষিত-নিপীড়িত মানুষের যে লড়াই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার ধারাবাহিকতা আজও চলমান। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জনগণের সাথে শুধু প্রতারণাই করে গিয়েছে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ায় তাদের সাথে বেইমানি করা হয়েছে। পাহাড়ে চলমান অন্যায়, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যেকোন লড়াইয়ে তরুণদের দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। আদিবাসীদের আগামী দিনের লড়াই-সংগ্রামে আমাদের সংহতি সবসময় থাকবে।

খেলা শেষে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি, চবি শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা এবং সঞ্চালনা করেন তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিবেক চাকমা। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও পিসিপি, চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এনতেস চাকমা।

ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশগ্রহণ করে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের টিম তাজিংডং ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের টিম হিল ফোর্স। খেলার প্রথমার্ধে তাজিংডং ব্যাটিং করে ৮৩ রান টার্গেট দেয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে হিল ফোর্স ১৮ রানে পরাজিত হয়। টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান পুরস্কার অর্জন করেন তাজিংডং টিমের উমংচিং মারমা, সেরা বোলার হন হিল ফোর্স টিমের প্রিয় চাকমা, ম্যাচ অব দ্য টুর্নামেন্ট হন তাজিংডং টিমের অংশে প্রু মারমা এবং ম্যান অব দ্য ফাইনাল নির্বাচিত হন তাজিংডং টিমের আপন চাকমা।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ঐক্য সুদৃঢ় করার জন্যে এবং তরুণ ছাত্রসমাজে এম এন লারমার আদর্শকে প্রসারের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রতিবছর এই টুর্নামেন্টটি আয়োজন করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন: ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা

গত ১ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাব জহুর হোসেন কনফারেন্স হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর সদস্য দীপায়ন খীসার সঞ্চালনায় এবং যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টমগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন-এর যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেনে, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা, চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সদস্য প্রণব কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি দীপক শীল, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেনে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত, বহু ভাষাভাষী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবিধানে তাদের পরিচয় অস্বীকার করার ঐতিহাসিক ভুলের কারণে জুম্ম জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক-মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দীর্ঘ দুই যুগের সংঘাতের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। আমরা আশা করেছিলাম, এই চুক্তি সেই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের পথ দেখাবে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে, প্রায় ২৮ বছর পরও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হয়নি। পাহাড়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য ও শোষণ আজও অব্যাহত। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমরা চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার দাবি করলেও কার্যকর উদ্যোগ

দেখা যায়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের সভা বারবার স্থগিত হওয়া, টাস্কফোর্সের বৈঠক আটকে যাওয়া এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের শিক্ষক নিয়োগে সাম্প্রদায়িক শক্তির বাধা- সবই চুক্তি বাস্তবায়নের পথে বড় অন্তরায়। রাষ্ট্রীয় নীরবতা ও সাম্প্রদায়িকতার মদদ পাহাড়ের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে- যা কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয়।

১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ ২৮ বছরে উপনীত। এই দীর্ঘ সময়ের কালক্ষেপণ চুক্তিটিকে কার্যত প্রতারণার দলিলে পরিণত করেছে। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে জুম্ম আদিবাসীরা রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন থেকে বঞ্চিত এবং ক্রমাগত প্রান্তিকতায় নিমজ্জিত হচ্ছেন। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পাহাড়ের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা জরুরি। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ বছর পূর্ণ হতে চললেও এখনো এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। যে অংশগুলো বাস্তবায়নের দাবি করা হয়, সেগুলোরও কার্যকারিতা বাস্তবে স্পষ্ট নয়। তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানের পর বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়ার যে অঙ্গীকার উচ্চারিত হয়েছিল-তার মূল বক্তব্যই ছিল সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান। তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা চুক্তির আগে যেমন ছিল চুক্তির পরেও তেমনই গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। ওই অঞ্চলে কার্যত একটি সেনাশাসনের বাস্তবতা এখনো বিরাজমান, যাকে অস্বীকার করা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসে আলোচনার ভিত্তিতে অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তির লক্ষ্য ছিল– পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অবিচার, ভূমি বিরোধ, মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ নানা সমস্যার সমাধান, এবং সংঘাতপীড়িত ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসন। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, চুক্তির মূল উদ্দেশ্য থেকে রাষ্ট্র অনেকটাই সরে গেছে, বরং সেখানে একটি বড় বাঙালি জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম বলেন, ২৮ বছর পেরিয়ে গেলেও চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ি আদিবাসীরা আজ মানবিক সংকটে, যার সমাধান অধরাই রয়ে গেছে। শুধু পাহাড়িরাই নয়- স্থানীয় বাঙালিরাও নানা বঞ্চনার শিকার, ফলে পার্বত্য অঞ্চলে সামগ্রিক অধিকার সংকট আরও জটিল আকার ধারণ করেছে। তাঁর মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কেবল ওই অঞ্চলের সমস্যা নয়, বরং এটি জাতির সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি জাতীয় সমস্যা।

অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানিয়ে বলেন, জাতীয় স্বার্থেই এখন এই চুক্তি বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। এসময় তিনি তিনটি দাবি তুলে ধরেন–

১. অনতিবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনরত পক্ষসমূহ এবং দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে সাথে নিয়ে একটি জাতীয় সংলাপ আয়োজন করতে হবে।

২. পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কার্যকর রোডম্যাপ ঘোষণা এবং চুক্তি বাস্তবায়নে দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার তালিকায় রেখে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে হবে।

আগামী সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবো: উইন মং জলি

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ সকালে বান্দরবান জেলা সদরের রাজার মাঠ প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই মন্তব্য করেন।

উক্ত সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জেএসএস নেতা থুই মং প্রু মারমা, হিল উইমেন ফেডারেশনের জেলা সভানেত্রী উলিসিং মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি সিং ওয়াই মং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান নেটওয়ার্কের আইন বিষয়ক সম্পাদক মংনু মারমা হেডম্যান প্রমুখ। এছাড়াও বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা গেছে।

সমাবেশে উইন মং জলি বলেন, 'দীর্ঘ দুই যুগের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বিএনপি সরকারের আমলে ১৩ বার এবং আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ৭ বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব আলাপ-আলোচনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জুম্ম জনগণের পক্ষে জেএসএস সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ২৮ বছর পার হলেও এটি আজও সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আজ প্রতারণার দলিলে পরিণত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'অস্ত্র জমা দেওয়া হলেও প্রশিক্ষণ জমা দেওয়া হয়নি, কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হলে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম হয়।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন বলেও জানান জেএসএস সহ-সাধারণ সম্পাদক।

মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মেঞোচিং মারমা বলেন, আমাদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে বুঝাতে হবে আন্দোলনের সপক্ষে। কার্বারী-হেডম্যানদের তাদের পুরনো ধ্যান থেকে বেরিয়ে নিয়ে এসে জুম্মদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সামিল করতে হবে। আমাদের বসে থাকার আর সুযোগ নেই।

সভাপতির বক্তব্যে সুমন মারমা বলেন, বিগত কোন সরকারের আমলে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যারা বিএনপি-আওয়ামী লীগ করে জুম্মদের মধ্যে তারা কেউই অধিকারের সপক্ষে আন্তরিকতা দেখাননি বরং সরকারের উগ্র বাঙালি ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের দোসর হয়ে পার্বত্য চুক্তি বিরোধীতার ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আমরা বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে ন্যায্য অধিকার ভোগ করার জন্য আন্দোলন করেছি: রাঙ্গামাটি সমাবেশে উষাতন তালুকদার

'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হোন' উক্ত স্লোগানের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটির জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রাঙ্গামাটির বিভিন্ন উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা থেকে কয়েক সহস্রাধিক জুম্ম জনতা এই গণসমাবেশে অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

গণসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক শিশির কান্তি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি মনি চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি রুমেন চাকমা প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ডা: গঙ্গামানিক চাকমা। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুনির্মল দেওয়ান।

সমাবেশে উষাতন তালুকদার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিল চাই বললেই চুক্তি বাতিল হয়ে যায় না। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের দাবি করছেন তারা কি বুঝেন এতে কি হবে? পার্বত্য চুক্তি বাতিল হওয়া মানে ৯৭ সালের পূর্বে ফিরে যাওয়া। যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে চান তাহলে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। উগ্রজাত্যভিমানী, মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে জুম্মদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করে সদিচ্ছার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের পথে আসতে হবে। জুম্মরা বন জঙ্গলের মানুষ, অশিক্ষিত মানুষ, মুর্খ মানুষ মনে করলে ভুল করবেন। আমরা দীর্ঘ ২ যুগ সশস্ত্র সংগ্রাম করেছি, কেউ বলে নাই আমরা স্বাধীনতা চাই, বিচ্ছিন্ন হতে চাই, তবু কেন বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেয়া হয়? আমরা বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার জন্য আন্দোলন করেছি, রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করেছি।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোন সরকারই সদিচ্ছার সাথে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অথর্ব করে রাখা হয়েছে, জেলা পরিষদসমূহকে যে সরকার আসে সেই সরকার তাদের দলীয় কর্মীদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করতে হলে পার্বত্য চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

বিজয় কেতন চাকমা বলেন, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এদেশের নাগরিকদের কতটুকু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে তা প্রশ্ন থেকে যায়। জুম্ম জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে গেলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের মরতে জানতে হবে। তরুণ প্রজন্ম ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকতর আন্দোলনে সামিল হলে কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

শিশির কান্তি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করে চুক্তিকে অকার্যকর করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। পাহাড়ের জুম্ম জনগণের মধ্যে ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টির চেষ্টা করে অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে না উঠার ষড়যন্ত্র চালানো হয়। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির নির্যাসগুলো ধ্বংস করে দিয়ে চুক্তিকে অকার্যকর ও অবাস্তবায়িত রেখে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনমিতি পরিবর্তন করে জুম্মদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র এখনো চলমান রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়োগসমূহ পরিষদের নিজস্ব আইন অনুসারে সম্পাদনা করতে হবে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোন সহযোগিতা পাননি। এগুলো কিসের আলামত? পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কিন্তু অধিকারের জন্য জুম্মরা লড়াই করতে জানে। অধিকারকামী জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেয়া হয়, পাহাড়ে দীর্ঘকাল ধরে যে অরাজকতা বিরাজমান তা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না।

মনি চাকমা বলেন, দীর্ঘ ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক সদিচ্ছার সাথে চুক্তি বাস্তবায়নে কোন সরকার এগিয়ে আসেনি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে বৈষম্য বিলোপের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের উপর নিপীড়ন বন্ধে কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়তই জুম্ম নারীরা নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই জুম্ম নারীদেরকে অধিকার সচেতন হয়ে লড়াই সংগ্রামে অধিকতর সামিল হতে হবে।

অ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান বলেন, বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে টালবাহানা করে জুম্ম জনগণের সাথে বেইমানি করে চলেছে। বিট্রিশ শাসনামলে জুম্মদের জন্য প্রণিত ১৯০০ সালের শাসনবিধি ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের শাসনামলে হাইকোর্টে মামলা করে বাতিলের চেষ্টা করা হয়েছে। আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট এই মামলা খারিজের দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না যা খুবই দুঃখজনক। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী জেলা পরিষদ তার নিজস্ব আইনে কাজ করার বিধান থাকলেও জেলা পরিষদগুলোকে সেভাবে কাজ করতে দেয়া হয় না। সারাদেশে ফ্যাসিস্ট হাসিনার শাসনামলে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হলেও জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি।

পিসিপি'র সভাপতি রুমেন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের জন্য সেটেলার বাঙালিরা নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামীলীগের বহিষ্কৃত নেতা কাজী মুজিবুরের নেতৃত্বে বহিরাগত সেটেলারগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাতিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা পূর্বে বিজাতীয় শাসনের বাইরে ছিল। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণিত সংবিধানে জুম্মদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে আমরা দেখি জুম্মরা যুগ যুগ ধরে পাহাড়ে বসবাস করছে। পাহাড়ে জুম্মরাই প্রথম আবাস তৈরি করেছিল। আশির দশকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন দেয়া হয়েছিল, এখন তারাই জুম্মদের বহিরাগত আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বরকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বরকল থানা শাখার উদ্যোগে গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে বরকলের উপজেলা মাঠ প্রাঙ্গণে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য বিধান চাকমা, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য শ্যাম রতন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বড়

হরিনা ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক নিলাময় চাকমা, কার্বারী অ্যাসোসিয়েশন বরকল উপজেলা কমিটির সভাপতি নন্দ বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বরকল থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুচরিতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি কবিতা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পায়া ম্রো প্রমুখ।

সমাবেশে বিধান চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আগের সময় হতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর চুক্তি হওয়ার পরের সময়ে কোন সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেও প্রতি সুদৃষ্টি দেয়নি। কোন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকারের লক্ষ্যে কোনো কাজ করেনি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের উপর নানাভাবে দমন-পীড়ন চালানো হয়। বাংলাদেশের কোন সরকার চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি।

শ্যাম রতন চাকমা বলেন, বর্তমানে শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে নাজেহাল অবস্থায় রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে অশান্ত রাখার জন্য সেটেলার বাঙালিরা প্রতিনিয়ত পায়তারা চালাচ্ছে। চুক্তি হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম পার্বত্য অঞ্চলে এবার হয়তো শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু চুক্তি হওয়ার পরে দেখতে পায় শাসনগোষ্ঠীর সেই বিমাতাসুলভ আচরণ। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হওয়ার আগে যেভাবে লড়াই সংগ্রাম করে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে ঠিক তেমনিভাবে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে।

সুমন চাকমা বলেন, ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৫৪ হাজার ধান্যজমি পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধ হলো জুম্ম জনগনের মরন ফাঁদ। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা মনে করেছিলাম জুম্ম জনগণের ভাগ্য হয়তো পাল্টে যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সাথে সরকার বিমতাসুলভ আচরণ করেছে।

বিশেষ অতিথি নিলাময় চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২৮ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র জুম্ম জনগনকে অধিকতর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

নন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের কঠোর থেকে কঠোরভাবে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারনে পাহাড়ে এখনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজমান। জুম্ম জনগনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে মহান পার্টির আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।

কবিতা চাকমা বলেন, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরেও যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় জুম্মরা এখনো নিরাপদে বাঁচার অধিকার লাভ করেনি। বহিরাগত সেটেলার বাঙালিরা পার্বত্য চুক্তিকে নস্যাৎ করে দিতে নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়েও প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সেটেলার বাঙালিরা যে অপতৎপরতা চালিয়েছে তা চুক্তি বিরোধী কার্যক্রমের অংশ। এছাড়া চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ইউপিডিএফ চুক্তির বিরোধীতা করে চলেছে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে চুক্তি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

পায়া ম্রো বলেন, সরকার চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সংকট এখনো কাটেনি। শাসনগোষ্ঠী দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের শাসন করছে। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে শাসকগোষ্ঠীর অপচেষ্টা এখনো বিরাজমান।

ইলেন চাকমা বলেন, আজ থেকে ২৮ বছর আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা এখনো পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়নি। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ অবধি শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের উত্তরণ ঘটেনি। অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের সকলকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বরকল থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিশান তালুকদারের সঞ্চালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বরকল থানা শাখার সভাপতি ইলেন চাকমা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি বরকল থানা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক জিতেশ চাকমা।

বাঘাইছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলায় গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে '২রা ডিসেম্বর উদযাপন কমিটি বাঘাইছড়ির' উদ্যোগে এক গণসমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গণসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ত্রিদীপ চাকমা (দীপ বাবু), পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কার্বারী প্রতিনিধি সমাপ্তি দেওয়ান, চেয়ারম্যান প্রতিনিধি বিল্টু চাকমা, হেডম্যান প্রতিনিধি এন্ড্রো খীসা প্রমুখ।

সভায় জুয়েল চাকমা বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে আমরা বলতে চাই, জুম্ম জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার উপর যদি প্রতারণা হয়, যে জুম্ম জনগণের ২৪ বছরের রক্ত পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির উপর যদি আঘাত করা হয়, তাহলে এই জুম্ম জনগণ তার প্রতিশোধ রক্ত দেয়া-নেয়ার মধ্যে দিয়ে তার সমাধান করবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সরকারের একটি পক্ষ চায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তাঁদের অধিকার না পাক। তারা চায় আমরা এখানে দাস হয়ে থাকি। তারা চায় আমরা এখান থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, নয়তো আমরা এই পার্বত্য চট্টগ্রাম, আমাদের এই মাটি-জন্মভূমি ফেলে অন্যত্র চলে যায়। এইটা তারা ভোগ করবে। এজন্য সেই অংশটি এই চুক্তি বাস্তবায়ন চায়না বলে ভিতরে ভিতরে চুক্তি বিরোধী একটি অংশকে সে দাঁড় করিয়েছে।

ত্রিদীপ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমাদের আশা ছিল এভাবে দুঃখ বেদনা নিয়ে আর আমাদের মিছিল-সমাবেশ করতে হবে না, কিন্তু আজ চুক্তিটি ১দিন, ২দিন, একমাস, দুই মাস যেতে যেতে এভাবে ২৮ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে ২৮ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এভাবে মিছিল-সমাবেশ করতে হচ্ছে। আমাদের জীবনে এর থেকে দুঃখের আর শোকের আর কিছু হতে পারে না। তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যারা নবীন, তারা উদ্যোগী হোন। নবীন-প্রবীণের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করবো।

বিল্টু চাকমা বলেন, বাংলাদেশ সরকার শুভবুদ্ধি উদয় করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চল হলেও, এই পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন আগুন লাগবে সেটি বাংলাদেশের জন্য কখনো শুভকর হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের আগুন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। তিনি আরও বলেন, আমরা জুম্ম জনগণ বিশ্বাস করে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আমরা বিশ্বাস করে কোন অপরাধী হইনি, কিন্তু বিশ্বাস যারা ভঙ্গ করে তারাই প্রকৃত অপরাধী। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এখনো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে লড়াইয়ের জন্য সংগ্রাম ছাড়েনি। সংগ্রাম ত্যাগ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২রা ডিসেম্বর উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও ৩৩ নং মারিশ্যা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আপন চাকমা।

গণসমাবেশ ও আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সদস্য জ্যোতিষ্মান চাকমা এবং গণসমাবেশের শুরুতে গণসংগীত পরিবেশনা করেন কাজলং মুরল্যে শিল্পীগোষ্ঠী ও বাঘাইছড়ি সাংস্কৃতিক একাডেমি।

জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলনে তরুণ সমাজকে যুক্ত হতে হবে: সাধুরাম ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্দোলন করছি, এই আন্দোলনে তরুণ সমাজসহ আমাদের সবাইকে যুক্ত হতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

গত ২ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ১০ ঘটিকায় বিলাইছড়ি উপজেলার ফারুয়া ইউনিয়নের একুজ্যাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন এইসব কথা বলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ফারুয়া ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবিন তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় গণসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা

কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, এগুজ্যাছড়ির হেডম্যান সমূল্য তঞ্চঙ্গ্যা এবং বিলুপ্ত ঘোষিত শান্তিবাহিনীর সাবেক গেরিলা টনি বম।

গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি ২০২৫, ফারুয়া, বিলাইছড়ি এর আহ্বায়ক জীবন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সহ-সভাপতি নির্মল তঞ্চঙ্গ্যা। উক্ত গণসমাবেশে ফারুয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত জুম্ম অংশগ্রহণ করেছেন বলেও জানা গেছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস অত্যন্ত বীরত্বপূর্ণ। সেই লড়াই সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেকে নিজেদের মূল্যবান জীবন হারিয়েছে, অনেকে জেলে গিয়েছে, অনেকে নিজের আদরের সন্তানকে হারিয়েছে, অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছে। এইসব কিছুর বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ভবিষ্যত এখন এক অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বীরোত্তম তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, আমরা সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমরা অনেক আশা ভরসা নিয়ে চুক্তিতে উপনীত হয়েছিলাম। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো সরকারই সদিচ্ছা আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহলে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকবে না, আমাদের সংস্কৃতি টিকে থাকবে না, আমাদের ভাষাগুলো থাকবে না। আমরা সবকিছু হারিয়ে ফেলব। সেগুলো না হারানোর জন্যই আমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে এসে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

যুবনেতা সুমিত্র চাকমা বলেন, চুক্তি মোতাবেক যদি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতো, তাহলে আজকে পাহাড়ে বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের সংখ্যা বেড়ে যেতো না। ফারুয়া থেকে বিলাইছড়ি, বিলাইছড়ি থেকে রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি থেকে খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি থেকে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এলাকায় এলাকায় গণসংগঠন গড়ে তুলতে হবে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে জুম্ম ছাত্র যুব সমাজ তথা সমগ্র জুম্ম জনগণকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে র‍্যালি, গণসঙ্গীত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

২ ডিসেম্বর ২০২৫ "জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন" এই আহ্বানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে র‍্যালি, গণসঙ্গীত ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামস্থ নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার চত্বরে দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় উদ্বোধনী পর্বের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং উদ্বোধনী পর্বের পরে র‍্যালি সহকারে এসে জেএম সেন হল প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা শুরু হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয়। এছাড়াও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক রণজিৎ কুমার দে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মহিউদ্দিন মাহিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শরৎ জ্যোতি চাকমা, কবি ও সাংবাদিক হাফিজ রশিদ খান, ঐক্য ন্যাপ, চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাশ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি, চট্টগ্রামের আহ্বায়ক তাপস হোড়ের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সঞ্চালনা করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সহ-সভাপতি অনিল বিকাশ চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব হ্লামিউ মারমা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক অপূর্ব চাকমা।

আলোচনা সভার শুরুতে গণসঙ্গীত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. জিনবোধি ভিক্ষু বলেন, দেশের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীকে কেন চুক্তিতে উপনীত হতে হবে যদি সরকার তাদেরকে নিজ নিজ নায্য অধিকার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুযোগ দেয়। সংখ্যালঘুরা যদি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব নিয়ে বসবাস করতে না পারি তাহলে যারা শান্তির স্লোগান দিচ্ছে তাদের কথার সাথে কাজের মিল আছে কিনা সন্দেহ আছে। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে সমাধানের জন্য প্রধান সমস্যা ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে। আপনারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন বিধায় ক্ষমতার জোরে আমাদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। আজকে আমরা যে প্রতিবাদ মিছিলে নিজেদের একাত্ম করতে বাধ্য হয়েছি এগুলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত নয়। আপনারা আমাদের যে শান্তনার বাণী শুনান, আশার বাণী দেন কিন্তু বাস্তবে গেলে দেখা যায় আপনাদের সেই অন্তরের কুবুদ্ধিই আছে। আমরা সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী, দেশের সকল নাগরিক সমঅধিকার, সমবন্টন নিয়ে সহাবস্থান করতে চাই। আপনারা যদি সত্যি মানবিক, উদার হন তাহলে দেশের আদিবাসীদের অধিকার ফিরিয়ে দিন।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক রঞ্জিত কুমার দে বলেন, সরকারের ইচ্ছাতেই পাহাড়ে আদিবাসীদের ওপর নিপীড়ন সংগঠিত হচ্ছে। চুক্তি নিয়ে অবাঞ্ছিত বক্তব্য যেকোন সরকার থেকে কাম্য নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরও নির্যাতন নিপীড়ন চলমান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী সংখ্যালঘু সমস্যা বুঝতে অক্ষম যার কারণে দেশে দীর্ঘসময় ধরে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ হয়না। আদিবাসীরা ন্যায়ের এবং মৌলিক অধিকার আদায়ের দাবি তুললে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী তকমা দেওয়া হয়। তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে রোধ করার চেষ্টা করা হয়। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক লড়াই-সংগ্রামের ফল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ পর্যন্ত পাঁচটি নির্বাচিত দলীয় সরকার ও দুইটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা এলেও চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তারা আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসেনি। পাহাড়ের তাই আমরা এখনো গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেখতে পাই না।

শাহ আলম বলেন, পাহাড়ি জনগণকে তাদের অধিকার প্রদান না করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আরো বিপদগ্রস্ত হবে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে অনেকেই

রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে কিন্তু দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়নি। একইভাবে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীতেও আমরা দেখি জুলাই আন্দোলনের নাম ভাঙিয়ে কতকিছুই হচ্ছে অথচ জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশ থেকে বৈষম্য দূর করা। বৈষম্য দূর হওয়া দূরের কথা আমরা নাগরিক অধিকারও হারাতে বসেছি এখন। আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীদের লড়াই-সংগ্রামে নীতিগতভাবে পাশে থেকেছি আগামীতেও থাকবো। ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার কোন বিকল্প নেই।

প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী বলেন, পাহাড়ের সংকট সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অতিদ্রুত বাস্তবায়ন দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার যথাযথ সমাধান না হলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরো জটিলতার দিকে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। কয়েক বছর অন্তর অন্তর সরকার পরিবর্তন হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন হয়না। ২৮ বছর আগে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও সরকার সেই চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো বাস্তবায়ন করেনি উপরন্তু আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন জারি রেখেছে।

ড. মুহাম্মদ মহিউদ্দিন মাহিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির মৌলিক ধারাসমুহ এখনও অবধি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পাহাড়ে সেই প্রত্যাশিত শান্তি ফিরে আসেনি। এই চুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও তা আজ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে। এমন বাস্তবতায় পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি দিনদিন কঠোরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

শরৎজ্যোতি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে এখনও ২৫টি ধারা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়েছে। বাকিগুলো কিছু আংশিক ও কিছু পুরোপুরি অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। অবাস্তবায়িত ধারাগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোই চুক্তির মৌলিক ধারা। এই মৌলিক ধারাসমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে এখনও অস্থিতিশীল পরিবেশ জিইয়ে আছে। এই অস্থিতিশীল পরিবেশ একইসাথে পুরো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একটা ক্ষতিকর দিক। পার্বত্য চুক্তি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যাকে সমাধানের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে না এবং সম্ভবও নয়।

হাফিজ রশিদ খান বলেন, দেশে-বিদেশে স্বীকৃত একটি চুক্তির ২৮ বছর পরেও পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য দেশের নাগরিক সমাজের অন্যতম একটি অংশ বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা এখনও আন্দোলন সমাবেশ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেখানকার নাগরিক সমাজ চেয়েছিল চুক্তির মাধ্যমে তাদের ভূমির অধিকারসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হবে। তারা জনসংহতি সমিতির দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের সাথে সমবেত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারও তাদের যে দাবিদাওয়া ছিল সেগুলোর সাথে একমত হয়ে চুক্তিতে উপনীত হয়। কিন্তু যখন চুক্তি স্বাক্ষরের ২৮ বছর পরও সেই অঙ্গীকার পূর্ণতা না পায় তখন আমাদের ভাবতে বাধ্য করে এখানে সরকারের দায়বদ্ধতার দুর্বলতা আছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কথা শুনতে পাচ্ছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গঠনের জন্য পাহাড়িরা বঞ্চিত থাকবে কেন? পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নায্য অধিকার চুক্তির মাধ্যমে সরকার যেহেতু মেনে নিয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়নের দায়িত্বও সরকারের।

অজিত দাশ বলেন, স্বাধীনতার আজ ৫৪ বছর পেরোতে যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত আমাদের সামাজিক মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতে হচ্ছে। দেশে এখন যেভাবে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উত্থান হচ্ছে এই পরিবেশে বাংলাদেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ টিকে থাকা মুশকিল। এই বাস্তবতায় দেশের সকল প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লড়াই-সংগ্রামে আমাদের সকলের পাশে থাকতে হবে।

প্রদীপ কুমার চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে কথা ছিল পাহাড়ি জুম্ম জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ অধিকার নিয়ে দেশের অন্যান্য নাগরিকের মত বেঁচে থাকবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের আজ ২৮ বছর পেরিয়ে গেলেও সেই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর তাদের নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হতে হচ্ছে, তাদের জীবনের নিরাপত্তার শঙ্কায় থাকতে হচ্ছে। আমরা চাইনা পাহাড়ে অশান্তি থাকুক, স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তির বাস্তবায়ন অতীব জরুরি।

এছাড়াও আলোচনা সভায় সংহতি বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা ও ত্রিপুরা কল্যাণ ফোরামের সাবেক সভাপতি সুরেশ বরণ ত্রিপুরা প্রমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি উদযাপন কমিটি, চট্টগ্রামের আহ্বায়ক ও আলোচনা সভার সভাপতি তাপস হোড়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার ২৫তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৫ সম্পন্ন

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ 'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' স্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী মহানগর শাখার ২৫তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল- ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক হ্লামংচিং মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে জগদীশ চাকমা বলেন, ভূমি কমিশনের সভা বসলেই পিসিসিপি নামক সেটেলারদের সাম্প্রদায়িক একটি সংগঠন থেকে সভায় বাধা প্রদান করে এবং চুক্তি বাতিলের দাবি জানায়। জুম্ম জনগণ এবং ছাত্র সমাজকে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সামিল হতে হবে। যার জন্য দক্ষ, প্রায়োগিক, আদর্শিক কর্মী গড়ে তোলা প্রয়োজন।

অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পিসিপি পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র লড়াকু সংগঠন ছিল, এখনো আছে। জুম্ম জনগণের বৃহত্তর স্বার্থেই পিসিপি কাজ করে। তিনি বলেন, আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক দর্শন, সংগঠনকে জানা, অধ্যয়নে সংগঠনের প্রতি টান বেড়ে যায়। সংগঠনকে ধারণ করতে পারলে কেউ সংগঠন ত্যাগ করার মানসিকতা লালন করবেনা।

হ্লামংচিং মারমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ লংগদুর গণহত্যার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠন হয়েছিলো। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন নয়, এটি একটি পাঠশালাও বটে। তিনি আরো বলেন, ইউপিডিএফ চুক্তির পরপরই শান্তিবাহিনীর প্রত্যগত সদস্যদের হত্যার মধ্য দিয়ে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিলো। তারা চুক্তির বিরোধিতা করে জুম্ম স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। সুতরাং ইউপিডিএফ এবং চুক্তি বিরোধীদের সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বন্দ্ব ভাতৃঘাতি সংঘাত নয়, বরং আদর্শিক দ্বন্দ্ব বলতে পারি। আর আমরা সেটাই করছি যেটা জুম্ম জাতির জন্য কল্যাণকর।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি বিজয় চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে সঞ্চালনা করে একই কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার অর্থ সম্পাদক ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যা।

সম্মেলন শেষে সুমন চাকমাকে সভাপতি, ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাচুর্য্য চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার ২৫তম শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন হয়।

পিসিপি বিলাইছড়ি থানা শাখার ২১তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিলাইছড়ি থানা শাখার ২১তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল গত ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ বিলাইছড়ি উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য টিপু চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিকো চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক করুণ জ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

এছাড়াও উপজেলা সদরের বিভিন্ন এলাকার ছাত্র ও যুব সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় টিপু চাকমা বলেন, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত জুম্ম জনগণের হাতিয়ার হিসেবে পিসিপিকেই সর্বাগ্রে রুখে দাঁড়াতে হবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের

অনেক জুম্ম ছাত্র ও যুবক বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। অনেকেই শাসকগোষ্ঠীর পাতানো ফাঁদে পা দিচ্ছে, কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে নিজেদের ও জাতীয় ভবিষ্যৎ সংকটে ফেলছে। সেই তরুণদের নিকট আলোর দিশারী হয়ে মুক্তি ও প্রগতির বার্তা নিয়ে পিসিপিকেই পৌঁছাতে হবে।

জিকো চাকমা বলেন, নব্বই দশকের বিপ্লবীপনা ইতিহাস পিসিপির কর্মীদের জন্য পাথেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ছাত্র ও যুব সমাজকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করতে মহান পার্টির বার্তা প্রচার ও প্রসারে পিসিপিকেই গুরু দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, পার্টির বর্তমান লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য বৃহত্তর আন্দোলন সুসংগঠিত করে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিশ্চিত করা। তাই ছাত্র-যুব সমাজকে লৌহ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

করুণ জ্যোতি চাকমা বলেন, প্রকৃতঅর্থে জুম্ম জনগণকে প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন মহান পার্টি জেএসএস ও জুম্ম ছাত্র সমাজকে প্রতিনিধিত্বকারী পিসিপি'র জন্মলাভ এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা। যুগের পর যুগ বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণে নিষ্পেষিত ও পশ্চাদপদ চিন্তায় নিমজ্জিত জুম্ম জনপদে মুক্তি ও প্রগতির বার্তা নিয়ে মহান পার্টির আবির্ভাব। সেসময়কার শিক্ষিত ছাত্র সমাজ এম এন লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে মুক্তি ও পরিবর্তনের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলো।

পিসিপি বিলাইছড়ি থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি নিকেল চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলনে সঞ্চালনা করেন একই কমিটির সহ-সভাপতি খুলা বাবু তঞ্চঙ্গ্যাঁ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাসেল মারমা।

সম্মেলন শেষে নিকেল চাকমাকে সভাপতি ও দ্বীপ উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট বিলাইছড়ি থানা শাখা কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিকো চাকমা।

শিজক কলেজে পিসিপি'র নবীনবরণ অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় পিসিপি শিজক কলেজ শাখার উদ্যোগে 'শেকলে বাঁধা জীবন, কাঁদছে জুম পাহাড়, শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রাম হোক নবীনের অঙ্গীকার'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে শিজক কলেজে ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় সময়ে শিজক কলেজের হলরুমে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে।

পিসিপি শিজক কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক জগৎ আলো চাকমার সঞ্চালনায় এবং পিসিপি শিজক কলেজ শাখার সভাপতি রুপেজ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিজক কলেজের অধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত চাকমা, প্রধান আলোচক ছিলেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা, শিজক মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জ্ঞানময় চাকমা, পিসিপি রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, বাঘাইছড়ির হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ভূমিকা চাকমাসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুভাষ দত্ত চাকমা বলেন, সময়ে যেটা প্রয়োজন সেটা যদি কোন ব্যক্তি সম্পাদন করতে পারে, তাহলে সে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ। তাঁকে সর্বজনে পূজা করে, শ্রদ্ধা করে। আজকে আমাদের কলেজ ক্যাম্পাসের সামনেও এম এন লারমার একটা ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। মহান নেতা এম এন লারমা জুম্ম জনগণের জাতীয় দুর্দিনে আত্মসুখ, ব্যক্তিস্বার্থ বাদ দিয়ে জুম্মদের সামগ্রিক স্বার্থে সময়োপযোগী কাজ করতে পেরেছেন বলে তিনিও একজন মহান পুরুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পেরেছেন।

প্রধান আলোচক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, প্রকৃত নবীন তাকেই বলে যার মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মানবোধ আছে, লড়বার তেজ আছে এবং অন্যায়ের মোকাবেলা করার সাহস রাখে। আদর্শিক চেতনায় একত্রিত, সংগঠিত এবং মুক্তির সংগ্রামে সমাবেশিত হওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টা রাখতে দুর্ভেদ্য সৎসাহসিকতার পরিপক্কতা অর্জন করে এগিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার ষড়যন্ত্র আরও জোরদার হয়েছে। জুম্ম জনগণ আজ তাদের নূন্যতম মৌলিক মানবাধিকার চর্চার পর্যন্ত সুযোগ পাচ্ছে না। খাগড়াছড়িতে নিজের বোনের ধর্ষণের বিচার খুঁজতে গিয়ে গুইমারাতে জুম্মদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুটপাট ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনজন নিরীহ যুবককে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গণহারে মামলা দেয়া হয়েছে। সমাবেশে অংশগ্রহণ করার কারণে অনেকজনকে সেনাক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে টর্চার করা হয়েছে।

পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, নবীন মানে নতুন কিছু, নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন উদ্যোগ। এটাই নবীনের প্রকৃত মাহাত্ম্য। নবীনরা চাইলে একটি জাতিকে যেমনি এগিয়ে নিতে পারে, তেমনি ইতিহাসের পেছনের দরজা দিয়েও তারা সেই জাতির

পতনও ঘটাতে পারে। তাই নবীনদের অবশ্যই নবীনত্বের ইতিবাচক দিকটা বেছে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

সুমন চাকমা বলেন, পরিবর্তনের বিশ্বে আজ চারদিকে তরুণ-ছাত্র সমাজের অভূতপূর্ব উত্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা ইতিবাচক, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নেতিবাচক। এমনতর বাস্তবতায় আমাদের জুম্ম তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। এটা নিঃসন্দেহে খুবই ভালো এবং ইতিবাচক একটা লক্ষণ। তিনি বলেন, ছাত্র সমাজকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে হবে না, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গিয়েও তাদের অবশ্যই সময়োপযোগী, বিভিন্ন বই-পুস্তক, পেপার-ম্যাগাজিন অধ্যয়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সুপন চাকমা। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষ বক্তব্য প্রদান করেন কানন চাকমা। এছাড়া নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করেন শিজক কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জয়ন্তী চাকমা ও নবীনদের থেকে ফুলের তোরা গ্রহণ করনে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী তরুণ শান্তি চাকমা ও ত্রয়া চাকমা।

বিকেলের পর্বে শিজক কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ২৯তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ২৯তম শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৫ গত ১২ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি সদরস্থ উদ্যোগ রিসোর্স সেন্টার হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলন ও কাউন্সিল উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ- ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সভাপতি রুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা ও পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা প্রমুখ।

এছাড়াও সম্মেলন ও কাউন্সিলে জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পিসিপির বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে জুয়েল চাকমা বলেন, 'পঁচাত্তরের পর সারা দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তখন মহান পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের উপর বাংলাদেশ সরকারের সামরিক বাহিনীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে ওঠে। দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংগ্রামের পর অনেক ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সেই চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে বিগত কোন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। যার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মারামারি,

হানাহানি, ধর্ষণের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক বিশেষ গোষ্ঠীর সহায়তায় ভূমি কমিশনের মিটিং হওয়ার সিদ্ধান্ত হলে বাঁধা প্রদান করা হয়। তাই আমাদের এসব বিষয় উপলব্ধি করে জুম্ম জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হতে হবে।

রুমেন চাকমা বলেন, পিসিপি যেহেতু সমগ্র জুম্ম ছাত্র সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে তাই তাদের উপর-ই দায়দায়িত্ব বেশি বর্তায়। পিসিপি কর্মীদেরকে অবশ্যই প্রগতিশীল আদর্শের ভিত্তিতে নেতৃত্বের জায়গায় গড়ে উঠতে হবে। জুম্ম জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে কান্ডারীর ভূমিকা পালন করার জন্য রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মীকে অবশ্যই ব্যাপক অধ্যয়ন, গভীর অনুশীলন এবং এর সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। পিসিপি কর্মীদের সবসময় নীতি ও আদর্শের আলোকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

এলি চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ওপর প্রতিনিয়ত শোষণ-নির্যাতন চলমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নিরব ইসলামিকরণ চলছে। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব এখন তাই বিলুপ্তির পথে। এসব শাসন শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ছাত্র সমাজকে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সুনীতি বিকাশ চাকমা বলেন, যুগে যুগে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ বিজাতীয় শাসন শোষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এখনো পর্যন্ত চুক্তির মৌলিক ধারা গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। চুক্তির পূর্ববর্তী 'অপারেশন দাবানল' এবং চুক্তি পরবর্তী অপারেশন 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এখনো সেনাশাসন অব্যাহত রয়েছে। চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্মোদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এককথায় জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি সজল চাকমার সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জ্ঞান চাকমার সঞ্চালনায় সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইমন চাকমা এবং সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক করুন জ্যোতি চাকমা।

সম্মেলন অধিবেশন শেষে জ্ঞান চাকমাকে সভাপতি ও বিশ্বজিত চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিহির চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার ২৯তম কমিটি প্রস্তাবিত কমিটি নির্বাচিত করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ম্যাগলিন চাকমা।

পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার ২৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' স্লোগানকে কেন্দ্র করে গত ১৯ ডিসেম্বর রাঙ্গামাটি সদরস্থ উদ্যোগ রিসোর্স সেন্টার হল রুমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার ২৭তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক উইন মং জলি, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সবিনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সভাপতি

কবিতা চাকমা ও পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমা প্রমুখ।

এছাড়াও জনসংহতি সমিতি, মহিলা সমিতি, যুব সমিতি, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পিসিপির বিভিন্ন শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত চাকমার সঞ্চালনায় এবং বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুরেশ চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য

প্রদান করেন পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক সুব্রত তঞ্চঙ্গ্যা এবং ২৬তম বিদায়ী কমিটির বিগত এক বছরের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সনেট চাকমা।

সম্মেলনে উইন মং জলি বলেন, বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদী চিন্তাধারার উত্থান ঘটাতে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সুপরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম কৌশলে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য কেবল আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করা নয় বরং আদিবাসীদের বাঙালি মুসলিম পরিচয়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেওয়া। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও জুম্ম জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে পরিকল্পিতভাবে ইসলামিক চিন্তাধারা প্রবেশ করাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে একটি ধারাবাহিক ইসলামিকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছে।

অমিতাভ তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য অটুট রেখে এগিয়ে চলেছে। তবে বর্তমান তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ নানা বাস্তবতায় হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা শৈশবকাল থেকে আজীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তাঁর ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান ছাত্র ও যুবসমাজকে সেই সংগ্রামী চেতনা ধারণ করে আগামীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

সবিনা চাকমা বলেন, পাহাড়ে যাতায়াতের সময় জুম্ম জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীরা, রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে-যা পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সামরিকীকরণের নগ্ন বাস্তবতা তুলে ধরে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছত্রছায়ায় বসতি স্থাপনকারী সেটেলারদের দ্বারা জুম্ম নারী ও শিশুরা প্রতিনিয়ত যৌন নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হলেও এসব ঘটনায় অপরাধীদের দায়মুক্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অন্তর চাকমা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান অরাজক পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দেশে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পরিবেশ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই গণতান্ত্রিক শূন্যতা পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরেই এটি একটি কাঠামোগত বাস্তবতা হিসেবে জারি রয়েছে। এই দমবন্ধ করা অরাজকতা থেকে মুক্তির পথ রচনার জন্য ছাত্রসমাজের সামনে আর অপেক্ষার সুযোগ নেই-যুগোপযোগী করণীয় নির্ধারণ করে সংগ্রামের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার সময় এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ম্যাগলিন চাকমা বলেন, পিসিপির প্রসঙ্গ উঠলেই চোখের সামনে ভেসে আসে অধিকারহীন, নিপীড়িত ও শোষিত জুম্ম জনগণের দীর্ঘ যন্ত্রণার ইতিহাস। সমগ্র পৃথিবীতে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার অগ্রভাগে সর্বদা ছিল তরুণ্যর অদম্য শক্তি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের তরুণদেরই সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। ৭০-এর দশকের তরুণ প্রজন্ম যেমন তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, ঠিক তেমনি বর্তমান প্রজন্মকেও তাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

কবিতা চাকমা বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের লক্ষ্য ও সংগ্রামে অবিচল রয়েছে। জুম্ম ছাত্রসমাজের কাণ্ডারি হিসেবে এই সংগঠন তরুণ প্রজন্মকে নিরন্তর উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে চলেছে। তবে বর্তমানে তরুণ ও যুবসমাজের একটি অংশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শামিল না হয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার আশায় জাতীয় রাজনীতিতে ভিড়ছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের জন্য একটি বড় অন্তরায়।

সম্মেলন অধিবেশন শেষে অনন্ত চাকমাকে সভাপতি, ইমন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুব্রত তঞ্চঙ্গ্যাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার ২৭তম কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির শপথবাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক রনেল চাকমা।

এইচডব্লিউএফ রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ১৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ 'সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত-দৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি, জুম্ম জনগণের

মুক্তির সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে নারী সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে অধিকতর সামিল হোন' স্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি সদরস্থ উদ্যোগ রিসোর্স সেন্টার হল রুমে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ১৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছাত্র বিষয়ক সহ-সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উলিসিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুবসমিতি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিকো চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে জুয়েল চাকমা বলেন, আমরা যদি পরিবর্তন হতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে দক্ষ হতে হবে। তারপরেই পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে সহজ হবে। আদিম সাম্যবাদ যুগে নারীরা সমঅধিকার ভোগ করত। উৎপাদন থেকে শুরু করে বিজ্ঞান অগ্রগতির পেছনে নারীদের অবদান ছিল অসীম। আজকে যে সারা পৃথিবীতে কাজের কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট হওয়া এখানেও নারীদের ভূমিকা রয়েছে। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্তর-আশির দশকে সামন্তীয় সমাজের নানা গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করে, সমাজে শাসন-শোষণ এবং অশিক্ষিত ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজকে উপেক্ষা করে অধিকার আদায়ে সংগ্রামে নারীদের ভূমিকাও অপরিহার্য রয়েছে।

আশিকা চাকমা বলেন, যুগে যুগে সমাজ যখনি পরিবর্তন হয়েছে তখনি নারীদের অধিকারের জন্য করতে হয়েছে এক অদম্য লড়াই। যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সীমাবদ্ধতার সাথে সংগ্রাম করে জয় করতে হয়েছে বিশ্বকে। বলা যায় যত বেশি নারী সচেতন ততবেশি প্রগতিশীল সমাজ তৈরি হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতার এত বছর পরে এসেও দেশে নারীর অর্জন ও অবদানকে এখনো যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

তিনি বলেন, নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বৈষম্য ও সুযোগের অভাব নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথে এখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃতন্ত্রের শিকার বাংলাদেশের নারীরা। সেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা আরো বেশি প্রান্তিক। কাজেই নারীদের প্রান্তিক অবস্থান এর সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে এবং বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

উলিসিং মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীসমাজ একদিকে বিজাতীয় শাসন-শোষণ অপরদিকে সামন্ত চিন্তাধারার সমাজের শাসন-শোষণের শিকার। তাই বর্তমানে জুম্ম নারীদের মধ্যে রাজনীতি বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। সেজন্য এইচডাব্লিউএফ যেহেতু জুম্ম নারী শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন তাই এইচডাব্লিউএফের সকল নেতাকর্মীদের আরো রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ হয়ে ওঠতে হবে। প্রান্তিক জুম্ম নারী সমাজের কাছে পৌঁছাতে হবে।

তিনি আরো বলেন, দীর্ঘ ২৪ বছরেরও অধিক রক্তক্ষয়ী লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সুতরাং চুক্তিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজ তথা সমগ্র জুম্ম জণগণের ঐক্য সুদৃঢ় করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সুমিত্র চাকমা বলেন, যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনে নারীদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আজকে আমাদের ঠিকে থাকার সংগ্রামের মধ্যেও নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে বিজাতীয় শাসন আরেক দিকে সামাজিক নিপীড়ন এই দুইটি বাধা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নারীদেরকে। আমরা এখনো উপনিবেশিক শাসনের স্টীমরোলারে পিষ্ট রয়েছি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত মানুষের উপর শোষণ আর জুম্মদের মনে যে ভয়ের সংস্কৃতি বীজ বপন করে গিয়েছিলো সেই একই প্রক্রিয়া পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে চলমান রেখেছে।

জিকো চাকমা বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্ব জগতে অনেকাংশে নারীদের নেতৃত্ব অবস্থান দেখা যায় কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস্তবতা ভিন্নরূপ। পাহাড়ের সমাজ ব্যবস্থা এখনো সামন্তীয় ঘুণেধরা। যেখানে নারীদেরকে দমিয়ে রাখা হয়, তাদের মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতাতে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। ফলে অনেক নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেও একটা ভয়ের দ্বিধায় ভুগে। জুম্ম জনগণের যে চাওয়া, তার বিপরীতে শাসকগোষ্ঠীর চাওয়ার মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্যের মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বে আমাদের বিজয় হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আমাদের তরুণ সমাজের পাশাপাশি নারীদের অবস্থান আভ্যন্তরীণ ভিত্তির উপর। যার জন্য নারীদের রাজনৈতিক সচেতন হতে হবে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলার বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কাঞ্চনমালা চাকমা।

সম্মেলন অধিবেশন শেষে কবিতা চাকমাকে সভাপতি, এলি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং কাঞ্চনমালা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে এইচডাব্লিউএফ রাঙ্গামাটি জেলার ১৩তম কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা।

পিসিপি লংগদু থানা শাখার ২৬তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ লংগদু উপজেলার চিবেরেগা এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, লংগদু থানা শাখার ২৬তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার ভূমি বিষয়ক সম্পাদক বিনয় প্রসাদ কার্বারি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রুমেন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি লংগদু আঞ্চলিক কমিটির সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক তপন জ্যোতি চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সূচনা চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে বিনয় প্রসাদ কার্বারি বলেন, জুম্মদের পালিয়ে যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। তাই আমাদেরকে স্বভূমিকে আঁকড়ে ধরে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকার এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে ছাত্র ও যুব সমাজকে অবশ্যই সংগ্রামী হতে হবে। আমরা যারা বয়োবৃদ্ধ হয়েছি তারা শুধুমাত্র বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবো। কিন্তু এই ভূমিকে রক্ষার দায়িত্ব, অনাগত প্রজন্মকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব অবশ্যই তরুণদেরকে কাঁধে তুলে নিতেই হবে।

রুমেন চাকমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে অস্ত্রের মাধ্যমে দমিয়ে রাখতে চায়। চুক্তি পূর্ববর্তী সময়ের ১৫টি গণহত্যা সেটি প্রমাণ করে। দীর্ঘ ২৪ বছর সশস্ত্র আন্দোলনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অর্জিত হয়েছে। এই চুক্তি আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তে লেখা চুক্তি। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন সরকারই রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। বরং চুক্তিবিরোধী ও জুম্ম স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়েছে। যার ফলে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব আজ গভীর সংকটের মধ্যে রয়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তরুণ সমাজকে অবশ্যই ত্যাগী, সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করতে হবে।

তপন জ্যোতি চাকমা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে বিভৎস লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জন্মলাভ করেছিল। সংগ্রামী এলাকা হিসেবে আমাদের ভূমিকা আরো জোরদার হতে হবে। বর্তমানে আমাদের অস্তিত্ব সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে লড়াই সংগ্রাম ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। এজন্য তরুণ ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক সচেতন হয়ে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

সুরেশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র লড়াকু সংগঠন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত বিভক্তির সময় মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দুসহ অন্যান্য সকল ধর্মীয় জনগণ নিয়ে ভারত। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল বিধায় ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণ, বঞ্চনার ইতিহাস শুরু হয়েছিল। এই শোষণ থেকে মুক্তির পথ আমাদেরকেই বের করতে হবে। যুগে যুগে ছাত্ররাই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তির আন্দোলনেও তারা অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে, এখনও করে যাচ্ছে। ছাত্র সমাজকে সেভাবেই প্রস্তুত হতেই হবে।

সূচনা চাকমা বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলো বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সেখানে পুরুষদের ন্যায় নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সমাজের নারীরা যদি বিপ্লবী না হয় তাহলে একটি জাতি কখনো এগিয়ে যেতে পারবে না। আমাদের

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে অধিকার নিয়ে সচেতন হতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নারী সমাজকে অধিকতর সামিল হতে হবে।

পিসিপি লংগদু থানার শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি রিন্টুমনি চাকমার সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি জীবন শান্তি চাকমার সঞ্চালনায় সম্মেলন ও কাউন্সিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেনিও চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশন রিন্টুমনি চাকমাকে সভাপতি, রেনিও চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুজাতা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট লংগদু থানা শাখার ২৬তম কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রাচুর্য্য চাকমা।

পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর ও চবি শাখার ৩২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২ জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল খালেদ হল রুমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ৩২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য শরৎ জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি রুমেন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় সদস্য কবিতা চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

সম্মেলনে শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম আমরা বরাবরই অব্যাহত রেখেছি। শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত নিপীড়ন-দমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। আমাদের কর্মীবৃন্দের অনুসন্ধানের রাজনীতি করা উচিত। এক্ষেত্রে অধ্যয়ন- অনুশীলন-বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে চৌকস জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কাম্য। আমরা যেহেতু শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমাদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও অন্যান্য জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। চুক্তি বাস্তবায়নের কঠোর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজের অধিকতরভাবে এগিয়ে আসা সময়ের দাবি।

রুমেন চাকমা বলেন, বিশ্বব্যাপী পরাশক্তির দেশগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ তাদের অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে। নিপীড়িত সকল জাতিসমূহ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণও তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই চলমান রেখেছে। শাসকগোষ্ঠী যেইরূপে আমাদের দমন-নিপীড়ন করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের সেইরূপে প্রস্তুত হতে হবে। পারিপার্শ্বিক ভূরাজনৈতিক বিষয়সমূহ আমাদেরকে সূক্ষ্মভাবে ভাবতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে আমাদের তরুণ সমাজকে স্ব স্ব ভূমিকা মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত জবাব দিতে বৃহত্তর আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমগুলোকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে। প্রত্যকটি বিষয়ে অধ্যয়ন-অনুশীলন-বাস্তবায়ন জারি রাখতে হবে।

সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার আহ্বানকে জুম্ম ছাত্র সমাজের উপলব্ধি করা একান্ত জরুরি। দেশে-বিদেশে অবস্থান করা চুক্তিবিরোধী স্বার্থপরগোষ্ঠী তারা তাদের পূর্বের ন্যায় ষড়যন্ত্র অব্যহত রেখেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে জিইয়ে রাখার জন্য সেনা মদদপুষ্ট সেটেলার বাঙালিরা পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা চলমান রেখেছে। এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে পিসিপি কর্মীদের অধিকতর সংগ্রামী, আদর্শিক ও সাহসী হতে হবে। মহান পার্টি জনসংহতি সমিতি রাজনৈতিক বাস্তবতার বিবেচনায় তার আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করে নিয়েছে। সেই রূপরেখা অনুযায়ী ছাত্রসমাজকেও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

কবিতা চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লড়াই-সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারী যদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করে তবে আন্দোলন স্তিমিত হবে এবং তা হলে জাতীয় মুক্তি অসম্ভব। তার

প্রয়োজনীয়তা থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সংগ্রামী পথচলা। নারী সমাজকে আরো অধিকতরভাবে সংগঠিত করে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কঠিন এবং কঠোর আকার ধারণ করেছে। তার থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা আরো ভয়াবহ। পিসিপি জুম্ম ছাত্র সমাজের কাছে একটি আদর্শের নাম। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেকে জানতে ও চিনতে হলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদে যুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। ছাত্র-যুব সমাজকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হওয়ার যে বার্তা সেটা ধারণ করে অধিকার আদায়ের মহান লক্ষ্যে এম.এন.লারমার প্রদর্শিত পথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক আদর্শ চাকমার সঞ্চলনায় কাউন্সিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার বিদায়ী সভাপতি হ্লামিউ মারমা। সম্মেলনে পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা এবং পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এনতেস চাকমা।

কাউন্সিল অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখা, খুলশী থানা শাখা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এই সময় আদর্শ চাকমাকে সভাপতি, আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সুমান চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ৩২তম কমিটি গঠন করা এবং উক্ত নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জগদীশ চাকমা।

অন্যদিকে অন্বেষ চাকমাকে পুনরায় সভাপতি, প্রিয় জ্যোতি চাকমা (রিবেক)'কে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রেনঙি ম্রোকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ৩২তম কমিটি গঠন করা হয় এবং নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার ২৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

"সকল প্রকার বিভেদ ও জুম্ম পরিপন্থী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন,পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে

জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ বাঘাইছড়ি উপজেলার বটতলা কমিউনিটি সেন্টার প্রাঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখার ২৩তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি আঞ্চলিক কমিটির পরিচালক পুলক জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি রুমেন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বাঘাইছড়ি থানার সভাপতি লক্ষীমালা চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এযাবৎকালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

উক্ত সম্মেলনে পুলক জ্যোতি চাকমা বলেন, তরুণ প্রজন্মকে তারুণ্যের প্রচেষ্টায় অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ, জাতি ও সমাজে তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি নানাবিধ বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজে নানা ধরনের ভালো কাজে ব্যবহার করতে হবে। আগামীর লড়াই সংগ্রামে ছাত্র-যুব সকল পেশাজীবিকে এগিয়ে আসতে হবে নতুবা জুম্ম জণগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির মুখে পড়বে।

রুমেন চাকমা বলেন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তীতে বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির উত্থান পরিলক্ষিত হয়েছে এবং চুক্তি বিরোধী অপশক্তির সাথে মৌলবাদী শক্তির আতাঁতও পরিলক্ষিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তরুণ ছাত্র সমাজকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে অপশক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য তাদেরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জনসংহতি সমিতিই একমাত্র আদর্শিক মুক্তিকামী সংগঠন যেটি জুম্ম জনগণের মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান

করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম এবং দীর্ঘ সময়ে সেটি প্রমাণিত হয়েছে। জুম্ম তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব জনসংহতি সমিতি বৃহত্তর আন্দোলনে এগিয়ে নিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মিলন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ যুগে যুগে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে আসছে। তারই প্রেক্ষিতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ে পিসিজেএসএস দুই দশক ধরে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল এবং ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত করেছিল। সেই চুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে ছাত্র সমাজের বৃহত্তর আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত হতে হবে। ২০২৫ সালে জেএসএস এর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন সহ নানা ধরণের অপকর্মে জুম্ম জনগণকে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এর জন্যই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে।

লক্ষীমালা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্ষণের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এরকম নজীরবিহীন ঘটনা ঘটেছে যা বিচারবহির্ভূতভাবে রয়ে গিয়েছে। বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি, সে সংস্কৃতি থেকে আজো রাষ্ট্র বের হয়ে আসতে পারেনি। এই সংগ্রামে শুধুমাত্র পুরুষের অংশগ্রহণ যথেষ্ট নয়, নারী সমাজকেও ভূমিকা রাখতে হবে।

পিসিপির বাঘাইছড়ি থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদ্দীপন চাকমার সঞ্চালনায় কাউন্সিল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চীবরণ চাকমা এবং আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুদর্শন চাকমা।

চীবরণ চাকমাকে সভাপতি, সুদর্শন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রুপেজ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপি বাঘাইছড়ি থানা শাখা কমিটি গঠন করা হয় এবং নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আদর্শ চাকমা। একই সাথে পিসিপি, বাঘাইছড়ি থানা শাখা, শিজক কলেজ শাখা, সারোয়াতলী ইউনিয়ন আঞ্চলিক শাখা, খেদারমারা ইউনিয়ন আঞ্চলিক শাখা গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম সম্মেলন সম্পন্ন

গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ 'আদিবাসী হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আদিবাসী জুম্ম জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করুন'-এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটি সদরস্থ নিউ মার্কেটের আশিকা কনভেনশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ডা: গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এন্ড্রু জুয়েল সলমার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি জয়তী চাকমা ইনু, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও জাক এর সভাপতি শিশির চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন সভাপতি ও বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে বক্তারা পার্বত্য অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ অধিকার নিশ্চিত করবে-এমন প্রত্যাশা থাকলেও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতাশা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায়নি। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়েও তারা সংশয় প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে আদিবাসীদের বিষয়ে কী প্রতিশ্রুতি থাকবে, পাশাপাশি 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহৃত হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। পাহাড়ি জনগণের অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষায় কারা প্রকৃত অর্থে দায়বদ্ধ, তা জনগণের কাছে ইতোমধ্যেই স্পষ্ট বলেও তারা উল্লেখ করেন।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো কার্যকর ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। সরকার গঠনের পর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনায় এখনো কোনো দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে আদিবাসীরা বিচারহীনতা, অনিশ্চয়তা ও গভীর আত্মপরিচয় সংকটে দিন কাটাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো বাস্তবায়িত না হওয়ায় আদিবাসীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

এই সময় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব বলে বক্তারা অভিমত প্রদান করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম রাঙামাটি পার্বত্য জেলা শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা (নান্টু)'র সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা।

সম্মেলন সভা শেষে প্রকৃতি রঞ্জন চাকমাকে সভাপতি, ইন্টুমনি তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক এবং ক্যাসামং মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়াও সভাপতি প্রকৌশলী অব: মোহিনী রঞ্জন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা (নান্টু), সাংগঠনিক সম্পাদক ধনঞ্জয় তঞ্চঙ্গ্যাকে নিয়ে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম রাঙামাটি পার্বত্য জেলা শাখার কার্যকরী কমিটি এবং সভাপতি মঙ্গল কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক রিনেল চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক জগদীশ তঞ্চঙ্গ্যাকে নিয়ে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম রাঙামাটি সদর উপজেলার শাখা কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সম্মেলনে নতুন কার্যকরী কমিটির শপথ বাক্য পাঠ করান সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এন্ড্রু জুয়েল সলমার।

চবিতে রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর বার্ষিক মিলনমেলা ও ৮ম কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সংগঠন রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মিলনমেলা ২০২৬ ও ৮ম কাউন্সিল ক্যাম্পাসের বোটানিক্যাল পুকুর পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার্ষিক মিলনমেলা ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কাঞ্চন চাকমা, ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক উমে ছেন, চারুকলা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক হ্লুবাইশু চৌধুরী প্রমুখ।

এই সময় ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, আদিবাসী সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমে আমরা একে অপরকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারব। রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক অঙ্গণে ভূমিকা রেখে আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও আদিবাসী শিক্ষার্থী সমাজের কাছে নিজ নিজ ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করে দিচ্ছে যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। নিজেদের সংগঠনের জন্য নিজেদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজে শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

সহকারী অধ্যাপক উমে ছেন বলেন, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা জাতিগত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রধান উপকরণ। প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো ধারণ ও লালন করা জরুরি। নিজের সংস্কৃতিকে চর্চার মাধ্যমে ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য রঁদেভূর মতো সংগঠন প্রাসঙ্গিক। রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীকে কাজ করার মাধ্যমে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সহকারী অধ্যাপক হ্লুবাইশু চৌধুরী বলেন, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে ধরে রাখার মাধ্যম ভাষা। শিল্প চর্চার মাধ্যমে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য টিকে থাকবে। আমাদের অস্তিত্বকে বাঁচাতে হলে শিল্পচর্চার কোন বিকল্প নেই। শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে বা থেমে গেলে মানুষের নেতিবাচক মনোজাগতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সংস্কৃতি কেবল পোশাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ধারণ ও লালন করার মধ্যে নিহিত। রঁদেভূ সকল জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ঐক্যবদ্ধ করে যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসার দাবিদার।

রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক নুখ্যাইমং মারমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি রবি বিকাশ

চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি ভুবন চাকমা। এছাড়াও আলোচনা সভায় বিদায়ী বক্তব্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি পহেলা চাকমা।

কাউন্সিল পর্বে সভাপতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জাল্লাং এনরিকো কুবি, সাধারণ সম্পাদক একই শিক্ষাবর্ষের পালি বিভাগের শিক্ষার্থী শ্রেয়া তালুকদার ও সাংগঠনিক সম্পাদক একই শিক্ষাবর্ষের সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী ক্যাপরিও চাকমাকে নির্বাচিত করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সেটেলার-রোহিঙ্গা কর্তৃক আদিবাসীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বান্দরবানের আলীকদমে ম্রো আদিবাসীদের ওপর রোহিঙ্গা ও সেটেলার কর্তৃক দুই দফায় সন্ত্রাসী হামলা এবং খাগড়াছড়ির কমলছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভূমি বেদখল ও আদিবাসীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম মহানগরের চেরাগী মোড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা ও পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের যৌথ উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সভাপতি শুভ দেবনাথ, পিসিপির চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুমান চাকমা, চবি শিক্ষার্থী কথি ম্রো প্রমুখ।

পিসিপির চবি শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমার সভাপতিত্বে ও পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির চবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনঙি ম্রো।

এই সময় প্রসেনজিৎ চাকমা বলেন, পাহাড়ে অন্যায় নিপীড়নের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে, অথচ প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে। পার্টি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। এমন কোনো দিন বাদ যায়নি যেদিন কোথাও না কোথাও পাহাড়ের মানুষ নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়নি। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে এদেশের অখন্ডতার প্রতি সম্মান রেখে আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।

শুভ দেবনাথ বলেন, বাঙালি জাতি দীর্ঘ দুই দশক পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। অথচ তারা নিজেরাই পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জনগণের ওপর শোষণ-নিপীড়ন বহাল রেখেছে। রাষ্ট্র স্বয়ং পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। এই সময়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম

চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না করে আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নেয়া হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য করা হচ্ছে, শোষণ নির্যাতন জারি রাখা হচ্ছে যা রাষ্ট্রের জন্য শুভকর নয়।

রিবেক চাকমা বলেন, শহরাঞ্চল কিংবা প্রান্তিক এলাকা সর্বত্র জুম্ম জনগণের অধিকারকে খর্ব করা হচ্ছে। আলীকদম ও কমলছড়ির ঘটনায় প্রশাসন বরাবরের মতো অদায়িত্বশীল আচরণ, আদিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্র যন্ত্রের আসল চরিত্র উন্মোচন করেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র স্বয়ং সন্ত্রাস উৎপাদন করে পাহাড়ের সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। সেখানে পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী সেখানকার স্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়ন করা হয়নি। উপরন্তু পূর্বের ন্যায় সামরিক শাসন জারি রাখা হয়েছে।

সুমান চাকমা বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর হামলার প্রত্যেকটি ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা প্রশাসন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় আলীকদম থানার অফিসার ইনচার্জ ম্রো সম্প্রদায়ের ভুক্তভোগীদের থানায় ডেকে প্রতারণা করেন এবং সেখান থেকে ফেরার পথে তারা পুনরায় হামলার শিকার হন। পাহাড়ের আদিবাসীদের উপর যুগ যুগ ধরে এ ধরনের অন্যায় নিপীড়ন চলমান রয়েছে। তিনি দেশের সকল স্তরের জনগণকে আদিবাসীদের ওপর চলমান নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

কথি ম্রো বলেন, আলীকদমে পুনঃপুন হামলা সংঘটিত হওয়ার ঘটনা প্রশাসনের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে। থানা থেকে ফেরার পথে রাস্তার মাঝখানে হামলা করা হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে যা কখনোই কাম্য নয় এবং সেখান থেকে এদেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। প্রশাসনকে এসব বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এই সময় সমাবেশ শেষে একটি মিছিল চেরাগি মোড় থেকে শুরু হয়ে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বর ঘুরে পুনরায় চেরাগি মোড়ে এসে সমাপ্ত হয়।

রাবিতে শহীদ তৈইচিং-আথুইপ্রু-আখ্রাউ মারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েট ও রাজশাহীতে অবস্থানরত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আয়োজিত 'তৈইচিং-আথুইপ্রু-আখ্রাউ মারমা স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৬'-এর সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম কনক, বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমির প্রধান হরেন্দ্রনাথ সিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা এবং টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক পরশ চাকমা।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও প্রতিযোগী দলের খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ তৈইচিং-আথুইপ্রু-আখ্রাউ মারমা'র স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এই সময় ড. আমিরুল ইসলাম বলেন, 'আমার বেশ কয়েকবার এই টুর্নামেন্টের আয়োজনে আসার সুযোগ হয়েছে। আপনারা একসাথে থাকেন এটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগে। এই খেলাধুলার আয়োজন অব্যাহত থাকুক- এই প্রত্যাশা করি।' তিনি শহীদ তৈইচিং-আথুইপ্রু-আখ্রাউ মারমাদের স্মরণ করেন এবং ছাত্রদের একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

হরেন্দ্রনাথ সিং বলেন, এই টুর্নামেন্টের আয়োজনে শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয়। এই আয়োজন চলমান থাকুক এই প্রত্যাশা করি। সর্বোপরি পাহাড় এবং সমতলের নিপীড়িত জনগণের অধিকার রক্ষার্থে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান এবং গুইমারা রামসু বাজারের শহীদদের প্রতি সম্মান জানান।

উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, এই পাওয়া আমার একার নয়। এই বিজয়ের পেছনে টিমের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের সহযোগিতা আছে। প্রতিবছর এই আয়োজন অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা করেন তিনি।

বিজয় চাকমা বলেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পারিক সম্পর্ক তা আরো সুদৃঢ় হবে। এছাড়াও খেলাধুলার পাশাপাশি তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের সামাজিক, রাজনীতি, সংস্কৃতি সহ নিজ জাতিসত্তার-সমাজের দায়বদ্ধতার কথা বিবেচনা নিয়ে নিজেকে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সুমন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উগ্রবাদী মহল কর্তৃক সাম্প্রদায়িক হামলা ঠেকাতে আমাদের একতা দরকার। সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করলেই আমাদের গোড়া শক্ত ও মজবুত হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এক মারমা তরুণীর ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার রামসু বাজার এলাকায় সেটেলার এবং সেনাবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন তৈইচিং-আথুইপ্রু-আখ্রাউ মারমা। এই ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন এবং স্থানীয় আদিবাসীদের আনুমানিক ১৫টি বাড়িঘর, ৬০টি দোকানপাট ও ১৩টি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ এবং ৭টি দোকানপাট লুটপাট করা হয়। এই শহীদদের স্মরণে পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়েছে।

এই টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো মেয়েদের জন্য ৬টি ইভেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিটি ইভেন্টে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে 'ফিনিক্স লিজিয়ন' বনাম 'জুম্ম কিংস' মুখোমুখি হয়। 'ফিনিক্স লিজিয়ন' ৪১ রান ব্যবধানে জুম্ম কিংসকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে জয় লাভ করে।

এই সময় রক্তিম চাকমাকে ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যাকে টুর্নামেন্টের ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ, নোয়েল ত্রিপুরাকে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী, এমং মারমাকে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি এবং রুবল বাবু চাকমাকে টুর্নামেন্টের ইমার্জিং প্লেয়ার নির্বাচিত করে পুরস্কার বিতরণ করার মধ্য দিয়ে উক্ত টুর্নামেন্ট সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ১১তম সভা অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী টানেল সাইট অফিসের টোল প্লাজা সংলগ্ন কমপ্লেক্স বিল্ডিং-এর কনফারেন্স রুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক মোঃ তৌহিদ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান সুদত্ত চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রতীপ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও যুগ্ম সচিব কংকন চাকমা।

সভায় বিগত ২০২৫ সালের ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত দশম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়। দশম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সদস্য সচিব পদে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে টাস্কফোর্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিয়োগ করা, ভূমি কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন করা, পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে কার্যাবলী হস্তান্তর করা, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির অফিস স্থাপন ও জনবল নিয়োগ করা ইত্যাদি অন্যতম।

সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করার প্রস্তাব করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম

জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর তবেই ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করার বিধান রয়েছে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন ৪০টি প্রত্যাহৃত সেনা ক্যাম্পে এপিবিএন মোতায়েন করার জন্য প্রস্তাব করেন। এসময় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এই প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করেন এবং উক্ত প্রস্তাবটি বাতিল করার আহ্বান জানান।

সভায় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ইঁদুর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জুমচাষীদের সাহায্য প্রদান এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করার বিষয়গুলো উত্থাপন করেন। এবিষয়ে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৈঠকটি সকাল ১১টায় শুরু হয় এবং বেলা ২:৩০ টা নাগাদ সমাপ্ত হয়।

নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সন্নিবেশিত করার আহ্বান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখার জন্য জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহকে চিঠি পাঠিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন।

গত ২০ জানুয়ারি ২০২৬, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের দুই যুগ্ম সমন্বয়কারী মানবাধিকার কর্মী জাকির হোসেন ও অধ্যাপক ড.খায়রুল ইসলাম চৌধুরী স্বাক্ষরিত রাজনৈতিক দলসমূহকে পাঠানো উক্ত চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সহ ৫ দফা দাবিনামা দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে সন্নিবেশ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

চিঠিটি ইতোমধ্যে বিএনপি, সিপিবি, বাসদ, বাংলাদেশ জাসদ, গণসংহতি আন্দোলন, এনসিপি, জামায়াত সহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল ও জোট সমূহকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাজনৈতিক দলসমূহকে পাঠানো এই চিঠিতে বলা হয়েছে, আপনারা সকলে অবগত আছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিসমূহ নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে স্বভাবতই বঞ্চিত থেকেছে এবং নিজেদের স্বকীয় শিল্প-সাহিত্য ও

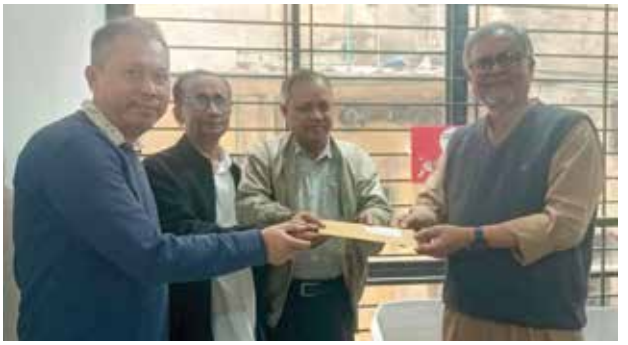

সংস্কৃতিকে বিকাশের মাধ্যমে বহুত্ববাদী বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় সামিল হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। এমনি বাস্তবতায় দীর্ঘ দুই যুগের অধিক সশস্ত্র সংঘাতের অবসানে বিভিন্ন সরকারের সাথে ধারাবাহিক ২৬ বার বৈঠকের মাধ্যমে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি'স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ২৮ বছর পেরিয়েও এই চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হয়নি এবং পার্বত্য সমস্যা এখনো সমাধান হয়নি। ফলে এ অঞ্চলে সংঘাতময় পরিস্থিতি এখনো চলমান আছে যেখানে সেখানকার আদিবাসীরা ক্রমাগত প্রান্তিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

এমতাবস্থায় সাম্প্রতিক জুলাই '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে সংহত ও সম্পূর্ণ করার জন্য এক সম্ভবনাময় সুযোগ তৈরি করেছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে একটি নতুন সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার জায়গা তৈরি হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করছি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামীর রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া আরো অধিক গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠবে। সেই প্রত্যাশার আলোকে আমরা আপনাদের নির্বাচনী ইশতেহারে পার্বত্য সমস্যা সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার তালিকার রাখার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

চিঠিতে নিম্নোক্ত ৫ দফা দাবির অঙ্গীকার রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে সন্নিবেশিত করার আহ্বান জানানো হয়:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিকী-করণ ও স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে;

৪. পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন'কে কার্যকরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাঁদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

৫. দেশের মূলস্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আদিবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের দাবিতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিশ্রুতি ও পাহাড়ের দূরবর্তী এলাকার ভোটারদের এবং সমতলের আদিবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১ ঘটিকায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন- এর আয়োজনে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে সঞ্চালনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের যুগ্ম সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন যুগ্ম সমন্বয়কারী জাকির হোসেন।

মূল বক্তব্যে জাকির হোসেন বলেন, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ি অঞ্চলের আদিবাসীরা দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনুন্নত অবকাঠামো এবং নিরাপত্তাজনিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করছেন। ফলে তারা জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নির্বাচনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় ভোটকেন্দ্রের দূরত্ব, নৌযান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তা তল্লাশির কারণে বহু আদিবাসী ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, আদিবাসীদের সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা জরুরি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক ভূমিকা প্রত্যাশা করেন। পাশাপাশি তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আদিবাসী ভোটারদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

লেখক ও সাংবাদিক আবু সাঈদ খান বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন আইনে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের সুযোগ না থাকায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি এই আইন সংশোধনের দাবি জানান এবং

পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানান।

আদিবাসী অধিকারকর্মী মেইনথিন প্রমিলা বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্য, সহিংসতা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। তিনি আদিবাসী নারী ও জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আদিবাসীদের সমস্যা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার আহ্বান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী ভোটারদের জন্য আবাসন, যাতায়াত সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, সামরিক কর্তৃত্বের অবসান, ভূমি কমিশন কার্যকর করা এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠনের দাবি উত্থাপন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন শেষে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষ থেকে আদিবাসী জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার সুরক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

এই সময় অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ জানানো হয়:

১. দূরবর্তী পাহাড়ের আদিবাসী ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে আবাসনসহ খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করা; এবং

২. সমতল ও পাহাড়ে ভোটকেন্দ্রগামী সকল আদিবাসী ভোটারদের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা এবং অযথা হয়রানি বন্ধ করা।

একই সাথে নির্বাচনপন্থী সকল রাজনৈতিক দলসমূহ ও আগামী সরকারের কাছে নিম্নে প্রত্যাশা ও দাবিসমূহ হলো:

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই চুক্তির দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়ন করা;

২. পাহাড়ে সামরিক কর্তৃত্ব ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের স্থায়ী অবসান করা;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিকীকরণ ও স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক যথাযথ ক্ষমতায়ন করা;

৪. পার্বত্য ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন'কে কার্যকরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ও ভারত থেকে প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসন করে তাঁদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা;

৫. দেশের মূলস্রোতধারার অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;

৬. ইউনিয়ন পরিষদসহ সকল স্তরের স্থানীয় সরকারে সমতলেরর আদিবাসীদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণ ও আদিবাসী জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

৭. সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা।

‘আমরা এক্সক্লুসিভ নয়, ইনক্লুসিভ হতে চাই’: জেএসএস’র ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে উষাতন তালুকদার

‘বিভেদপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হোন’– এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)-এর ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটির আশিকা কনভেনশন হলে রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেএসএস’র সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক শান্তি বিজয় চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা এবং পিসিপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক অন্বেষ চাকমা প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ডা. গঙ্গামানিক চাকমার সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুনির্মল দেওয়ানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহ-সাধারণ সম্পাদক অরুন ত্রিপুরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার বলেন, জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হলেও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অবিচল। তিনি সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘আমরা এক্সক্লুসিভ নয়, ইনক্লুসিভ হতে চাই। আমাদের অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্র ও দেশের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।’

তিনি আরো বলেন, জুম্ম জনগণকে জনসংহতি সমিতি মুক্তির দিশা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়ন তথা অধিকার প্রতিষ্ঠায় জুম্মদের লড়াই সংগ্রামে অটুট থাকতে হবে। সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদেরকে লৌহকঠিন শৃঙ্খলা ও ইস্পাত কঠিন ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করতে হবে। সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে অধিকতর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার বিকল্প নেই।

এছাড়া তিনি আরো বলেন, চুক্তি বিরোধীরা নিজেরা মহাবিপ্লবী সাজতে চায় কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নে ২৮ বছর ধরে যে প্রতিবন্ধকতা তারা সৃষ্টি করেছে তার দায় কি এড়াতে পারবে? চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্টিকে এক মুহূর্তও সময় দেওয়া হয়নি চুক্তি বাস্তবায়নে সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। আন্দোলনে কারা এগুতর চায়, কারা চায় না সেটা মুখের মিষ্টি কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে হবে। বিভেদ সমাধানের চাবি জনগণের হাতে। যারা এগুতর চায় না, সেটা যথাযথভাবে বুঝে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে জুম্ম জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করতে হবে।

বিশেষ অতিথি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা বলেন, যুগ যুগ ধরে জুম্ম জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসন-শোষণের শিকার হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, জুম্মদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে দুর্বল করতে সরকার ও শাসকগোষ্ঠী চুক্তি বিরোধী একটি পক্ষ সৃষ্টি করে জাতিকে বিভক্ত করেছে।

তরুণ প্রজন্মকে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়ে বিজয় কেতন চাকমা বলেন, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পিসিজেএসএস দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করেছে। তিনি বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে আদর্শবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে জাতির ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার আহ্বান জানান।

শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা বলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসে ব্যক্তি স্বার্থে বিচ্যুতির কারণে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি নতুন সরকারের ভূমিকাকে ঘিরে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, জুম্ম জনগণকে সুসংগঠিত করতে অঙ্গসংগঠনসমূহকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

শান্তি বিজয় চাকমা বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ‘অপারেশন দাবানল’ নামে পাহাড়ে এখনো সেনাশাসন অব্যাহত রয়েছে। ভূমি বেদখল, খুন, ধর্ষণসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা চলমান রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি।

আশিকা চাকমা বলেন, জুম্ম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৫ সালে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী সংগঠনের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়। চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র-যুব-নারী-পুরুষ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

'প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের শক্তির সমন্বয় দরকার' বলে মন্তব্য করে ছাত্রনেতা অন্বেষ চাকমা বলেন, ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশ শাসনামল পর্যন্ত জুম্ম জনগণ অধিকার বঞ্চনার শিকার। মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা-র নেতৃত্বে গঠিত জনসংহতি সমিতি জুম্মদের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

তিনি বলেন, চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনো অবাস্তবায়িত। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সভায় বক্তারা সর্বসম্মতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বৃহত্তর গণআন্দোলন জোরদারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জেএসএস এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ

একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন স্থানে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (জেএসএস) এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ।

রাঙ্গামাটি: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে সকাল ৭.৩০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজার এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ। এ সময় ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণের প্রাক্কালে জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি ডাঃ গঙ্গামানিক চাকমা, সাধারণ সম্পাদক নগেন্দ্র চাকমা, মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ইতি চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি রিতা চাকমা, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জয়তী চাকমা (ইনু), যুব সমিতির রাঙ্গামাটি শহর কমিটির সভাপতি রিতেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি রুমেন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)।

'সকল আদিবাসী মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে'– এই দাবি সম্বলিত ব্যানার উঁচিয়ে মিছিল সহকারে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পিসিপি। এসময় পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি কনেজ চাকমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক পাতলাই ম্রো, সাংগঠনিক সম্পাদক নেভাইঅং খুমি, ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পহেল চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান: মহান শহীদ দিবস ২০২৬ উপলক্ষে সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় বান্দরবানের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ সভাপতি মেঞোচিং মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উলিসিং মারমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য ফিলিপ খেয়াং, পিসিপির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক উবাথোয়াই মারমা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক রংথোইন ম্রো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিসত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু কর'– এই দাবি সম্বলিত ব্যানার উঁচিয়ে মিছিল সহকারে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে পিসিপি।

এসময় পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি আদর্শ চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক আশুতোষ তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য আইচুক ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী: মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশের প্রথম প্রহরে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী মহানগর শাখা। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এসময় পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, সাধারণ সম্পাদক ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রাচুর্য চাকমা প্রমুখ।

এছাড়াও মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই ও রোয়াংছড়িতে ভাষা শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চবিতে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) মানববন্ধন ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে আয়োজিত উক্ত কর্মসূচির উদ্যোগ নেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ। মানববন্ধনের আগে শহীদ মিনার থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত একটি মিছিল বের করা হয়।

পিসিপির তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রিশন চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি অন্বেষ চাকমার সভাপতিত্বে আয়োজিত মানববন্ধনে বিভিন্ন ছাত্রনেতা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শেখ জুনায়েদ কবীর বলেন, বাংলা ভাষার জন্য বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে, তাই অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দেশে পঞ্চাশের অধিক আদিবাসী জাতিসত্তা বসবাস করলেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয়ভাবে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা সময়ের দাবি বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

পিসিপির সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাষা-ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরও দেশের সংখ্যালঘু আদিবাসী জাতিসত্তার ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবমূল্যায়িত। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বান্দরবানের রেংমিতচ্যে ভাষা বিলুপ্তির পথে। একটি শিশু তার মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মূল্যবোধ শিখে- তাই প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা নিশ্চিত করা জরুরি।

রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি জাল্লাং এনরিকো কুবি বলেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষায় কার্যকর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, বম জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে আটকে রাখা হয়েছে এবং মধুপুরে গারোদের ফসলি জমি দখলের প্রচেষ্টা আদিবাসীদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি তৈরি করছে। এসব সংকট নিরসনে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান ও উচ্চপর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে অন্বেষ চাকমা বলেন, একটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি তার ভাষা। স্বাধীনতার ৫৬ বছরেও আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে কার্যকর উদ্যোগ দেখা যায়নি। বৈষম্যহীন বাংলাদেশের দাবি তখনই অর্থবহ হবে, যখন একজন আদিবাসী শিশু তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্ব স্ব পরিচয়ের স্বীকৃতি এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মানববন্ধন থেকে সংবিধানে আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা এবং আদিবাসী শিশুদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা অবিলম্বে চালু করার দাবি উত্থাপন করা হয়। আয়োজকরা জানান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেতনা কেবল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেশের সকল ভাষা ও জাতিসত্তার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এর পূর্ণতা আসতে পারে।

রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

'সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাত-দৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করুন'– এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি জেলা শাখার ৬ষ্ঠ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি শহরের উদ্যোগ রিসোর্স সেন্টারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা কমিটির বিদায়ী সভাপতি রিতা চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুবিনা চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। আমরা সবসময় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দিনযাপন করছি। পুরুষতান্ত্রিক ও সামন্তীয় সমাজব্যবস্থায় জুম্ম নারীদের বঞ্চনার অবসান ঘটাতেই মহিলা সমিতির জন্ম। কেউ আমাদের অধিকার থালায় সাজিয়ে দেবে না, সংগ্রাম করেই তা ছিনিয়ে আনতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, আন্দোলনের ফলে জুম্ম সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য কিছুটা কমলেও রাজনৈতিক বাস্তবতায় নারীদের আরও সক্রিয় হতে হবে। আত্মমুখিনতা ও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দক্ষ সংগঠক হিসেবে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মনি চাকমা বলেন, তৃণমূল পর্যায় থেকে জনগণকে সুসংগঠিত করে আন্দোলন জোরদার করতে হবে। কর্মীদের গুণগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবলিদানের মানসিকতা নিয়ে মাঠে থাকার শপথ নিতে হবে।

সুমিত্র চাকমা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিরাজমান হতাশা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জুম্ম নারীদের শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়া হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেত্রী উলিসিং মারমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সুমন চাকমা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের অনীহার সমালোচনা করেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিলরদের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী মেয়াদের জন্য নতুন জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে পুনরায় রিতা চাকমা সভাপতি, রিনা চাকমা সাধারণ সম্পাদক এবং মালবিকা দেওয়ান সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২৭ সদস্য বিশিষ্ট এই নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক শ্যামা চাকমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা।

FOOTBALL TOURNAMENT-2025
আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর
খাগড়াছড়িতে জুম্ম কিশোরীর উপর নির্যাতন কেন?

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নিপীড়ন বন্ধে পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন কর
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ভাইবোনছড়া এলাকায় ৮ম শ্রেণির এক জুম্ম ছাত্রীকে
সংঘবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদ এবং সকল ধর্ষককে গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
তারিখ: ১৮ জুলাই ২৫ সময়: সকাল ১০ ঘটিকা
স্থান: কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ, রাঙ্গামাটি
হিল উইমেন্স ফেডারেশন
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখা

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা